এপ্রিল ২০২৩ ▪ চৈত্র ১৪২৯-বৈশাখ ১৪৩০

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

পহেলা বৈশাখ

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস

পবিত্র ঈদুল ফিতর

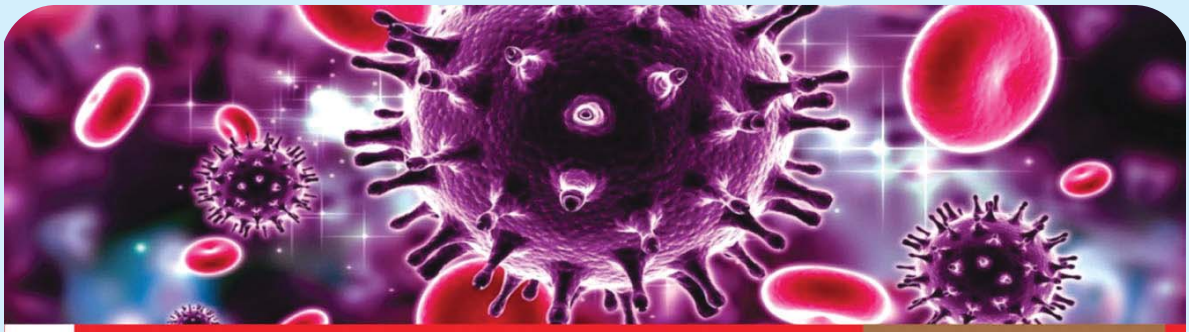

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- হঠাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

এপ্রিল ২০২৩ ❑ চৈত্র ১৪২৯ – বৈশাখ ১৪৩০

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬শে মার্চ ২০২৩ সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে দাঁড়িয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান– পিআইডি

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে ১৭ই এপ্রিল একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। ১৯৭১-এর এই দিনে মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। এ সরকারের তত্ত্বাবধানে মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন বন্দি অবস্থায় পাকিস্তানের কারা অন্তরালে। মুজিবনগর দিবসটি নানান দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দিবসটি উপলক্ষে রয়েছে নিবন্ধ।

বাঙালির জীবনে একটি অবিচ্ছেদ্য উৎসব বাংলা নববর্ষ। প্রতিবছর পহেলা বৈশাখ আমাদের কাছে রঙিন বর্ণিলভাবে ধরা দেয়, চারদিকে থাকে উৎসবের ছোঁয়া। বৈশাখি মেলা বসে নানা জায়গায়, হরেক রকম খাবার, খেলনার পসরা নিয়ে বসে এ মেলা। মেলা যেন প্রাণের উৎসব। পান্তা-ইলিশের কথা না বললেই নয়। পুরোনো জরাজীর্ণকে মুছে ফেলে নতুন আগামীর সম্ভাবনায় নববর্ষকে বরণ করে নেয় বাঙালি। এ সংখ্যায় এ বিষয়ে রয়েছে কবিতা ও নিবন্ধ।

প্রতিটি মুসলমানের কাছে রমজান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ মাসের ফজিলত অনেক বেশি কারণ এটি নিয়ামত, রহমত আর মাগফেরাতের মাস। রমজানে রোজা আদায় করার মাধ্যমে আমরা সংযমের শিক্ষা লাভ করি। এক মাস রোজা রাখার পর আসে মুসলমানদের বড়ো একটি ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর। ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়।

এছাড়া এ সংখ্যায় আরও আছে নানা বিষয়ের নিবন্ধ, গল্প, কবিতা ও নিয়মিত বিভাগ। আশা করি, সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
ডালিয়া ইয়াসমিন

সম্পাদক
ইসরাত জাহান

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ: নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
e-mail : dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

ভাটির রাজার রাজকাহন ৪
মুহা. শিপলু জামান

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন
নিভৃতচারী বঙ্গবন্ধু অন্তপ্রাণ ৮
ড. মিঠুন মোস্তাফিজ

শপথ নেবার মাহেন্দ্রক্ষণে
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার '৭১ ১১
জাফর ওয়াজেদ

শকাব্দ ও আরবি সন এবং বাংলা সনের সম্পর্ক ১৪
ড. মোহাম্মদ হাননান

ঈদুল ফিতরের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব ১৭
ড. আবদুল আলীম তালুকদার

নজরুলের ঈদের নাটক ২০
অনুপম হায়াৎ

বঙ্গবন্ধুর অনুপ্রেরণা ২২
ড. শিল্পী ভদ্র

'সামান্য ক্ষতি' বনাম রাজা ও রাজধর্ম ২৫
মাসুদ সিদ্দিকী

পহেলা বৈশাখ বাঙালির উৎসব ২৭
বিভুরঞ্জন সরকার

চা শ্রমিকের উন্নয়নে, চা শিল্পের উন্নয়ন ২৯
ইসরাত জাহান

মুজিবনগর সরকারের পটভূমি ৩১
কে সি বি তপু

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সুবর্ণ জয়ন্তী ৩৪

বৈশাখি মেলা: ঐতিহ্য ও সম্প্রীতির প্রতীক ৩৫
শামসুজ্জামান শামস

যেমন ছিল বঙ্গবন্ধুর ঈদ ৩৮
আজহার মাহমুদ

আমার দেখা নয়াচীন:
চীনাদের দেশপ্রেমের অনন্য উপস্থাপন ৩৯
শহিদুল ইসলাম

বঙ্গবন্ধু ও চলচ্চিত্র ৪১
জেসিকা হোসেন

অটিজম সচেতনতায় সরকারের নানা উদ্যোগ ৪২
নাসরিন সুলতানা

গল্প

এক কবির গল্প ৪৪
মাহবুব রেজা

কবিতাগুচ্ছ

৪৬-৪৯
হাসান হাফিজ, লিলি হক, অর্ণব আশিক, বোরহান মাসুদ, অদ্বৈত মারুত, রকিবুল ইসলাম, ম. মীজানুর রহমান, সুবর্ণা অধিকারী, হাসান আলীম, মিয়াজান কবীর, শাফিকুর রাহী, খান চমন-ই-এলাহি, আ.শ.ম. বাবর আলী, শাহীন খান, সাঈদ তপু, রাজীব হাসান

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৫০
প্রধানমন্ত্রী ৫১
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৫৩
শিক্ষা ৫৪
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫৫
উন্নয়ন ৫৬
অর্থনীতি ৫৬
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৭
নারী ৫৭
কৃষি ৫৮
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৯
যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক ৬০
চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি ৬০
ক্রীড়া ৬১

শ্রদ্ধাঞ্জলি:
চলে গেলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অভিনেতা এম. খালেকুজ্জামান ৬২

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস
১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
e-mail : md_jwell@yahoo.com

হাইলাইটস

পহেলা বৈশাখ

পহেলা বৈশাখ বঙ্গাব্দের প্রথম দিন। এ দিনেই পালিত হয় বাঙালির প্রাণের উৎসব নববর্ষ। এ জাতীয় উৎসবে ধর্ম-বর্ণ-গোত্রনির্বিশেষে সকল মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে। বাঙালি অতীতের কষ্ট-দুঃখ-গ্লানি ভুলে নতুন বছরকে বরণ করে নেয়। ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে পহেলা বৈশাখ নিয়ে আসে আনন্দ, সুখ ও সমৃদ্ধি। নববর্ষ উদ্‌যাপন সর্বজনীন উৎসবের রূপ গ্রহণ করেছে। পহেলা বৈশাখ বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্য, জীবন ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। বৈশাখি মেলায় বর্ণিল পোশাকে আবালবৃদ্ধবনিতার উপস্থিতিও আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। ছোটো ছোটো শিশু-কিশোরদের পতুলসহ নানা সামগ্রী কেনা এবং নাগরদোলায় উঠার ছোটাছুটিও আনন্দেরই অনুষঙ্গ। পহেলা বৈশাখ নিয়ে 'শকাব্দ ও আরবি সন এবং বাংলা সনের সম্পর্ক', 'পহেলা বৈশাখ বাঙালির উৎসব' এবং 'বৈশাখি মেলা: ঐতিহ্য ও সম্প্রীতির প্রতীক' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন যথাক্রমে পৃষ্ঠা–১৪, ২৭ ও ৩৫

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস

১৭ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ বাঙালি জাতির জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন। বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যতম মাইলফলক। ১৯৭০ সালে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ী দল আওয়ামী লীগ কিন্তু আওয়ামী লীগের সরকার গঠনে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী শুরু করে নানা ষড়যন্ত্র। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণে বাঙালি জাতি দিক নির্দেশনা পায়। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি বাহিনী শুরু করে বর্বর গণহত্যা। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেপ্তারের পূর্বেই ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয় এবং ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আমবাগানে এ সরকার শপথ গ্রহণ করে। এ স্থানের নামকরণ করা হয় মুজিবনগর। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় এ সরকারের অবদান অপরিসীম। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত হয় বাংলাদেশের বিজয়। মুজিবনগর দিবস নিয়ে 'শপথ নেবার মাহেন্দ্রক্ষণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার '৭১' এবং 'মুজিবনগর সরকারের পটভূমি' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন যথাক্রমে পৃষ্ঠা- ১১ ও ৩১

পবিত্র ঈদুল ফিতর

মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার ধারাবাহিকতায় বিদায় নেয় রহমতের দশক, মাগফেরাতের মাঝের দশ দিন ও ইতিকাফের স্বর্গীয় আমেজ, শবেকদর। এর পর আসে ঈদ। এ ঈদ ত্যাগের, নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার আর উৎসর্গ করার। এ ঈদ ধনী-গরিব, শহুরে-গ্রামীণ সবার মাঝে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধ রচনার। দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর রমজানের শেষ দিনে আকাশের এক কোণে বাঁকা চাঁদের মিষ্টি হাসি ঈদের জানান দেয়। সবাই একই সুরে গেয়ে ওঠে কাজী নজরুল ইসলামের সেই অমর সংগীত, 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ।' এ দিন যে আনন্দধারা প্রবাহিত হয়, অফুরন্ত পুণ্যময়তা দ্বারা তা পরিপূর্ণ। পবিত্র ঈদুল ফিতর নিয়ে 'ঈদুল ফিতরের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন পৃষ্ঠা–১৭

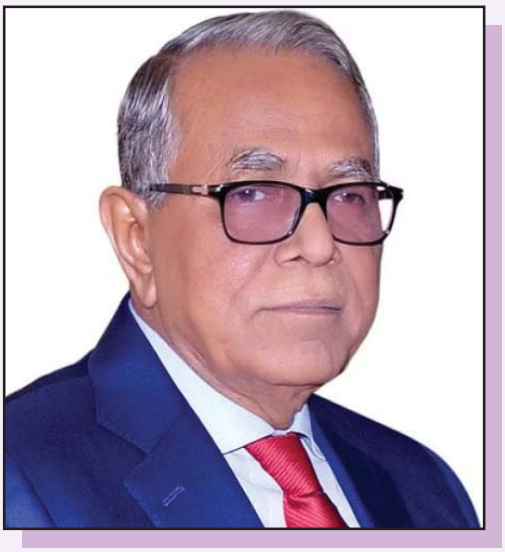

ভাটির রাজার রাজকাহন

মুহা. শিপলু জামান

'আমি লেখাপড়ায় মোটেও ভালো ছিলাম না। ১৯৬১ সালে ম্যাট্রিক পাস করেছি থার্ড ডিভিশনে। অবশ্য মিঠামইনের মতো প্রত্যন্ত হাওর অঞ্চলের জন্য এটি ছিল বিরাট কিছু। আশপাশের গ্রাম থেকেও মানুষ আমাকে দেখতে এসেছিল। ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছি রেফার্ড পেয়ে থার্ড ডিভিশনে। এলএলবি প্রথম দফায় পাসই করতে পারিনি। তখন দেশ মাত্র স্বাধীন হয়েছে। আমি দেশের আইনসভার সদস্য। অনেকে আমাকে বলেছিল, বই দেখে নকল করে পরীক্ষা দিতে। এটি আমার জন্য সম্ভবও ছিল। আমি সেই পথে যাইনি। দেশের একজন আইন প্রণেতা নকল করে পরীক্ষা দেবে, এটি হতে পারে না। ফেল করে দ্বিতীয় দফায় পাস করেছি। আমার জন্য সেটিই ভালো হয়েছে। আজ গর্ব করে বলতে পারি, দুইবারে আমি এলএলবি পাস করেছি। নকল করে পাস করলে আজ বুক ফুলিয়ে একথা বলতে পারতাম না। এখনো বাংলা লিখতে গিয়ে ভুল হয়ে যায়। এক পৃষ্ঠায় ১০/১৫টা বানান ভুল হয়। বই লিখতে গিয়ে এমনটাই হয়েছে। সবাই মিলে ঠিক করে দিয়েছে' (*দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৯শে মার্চ ২০২৩)। সম্প্রতি সাংবাদিকদের সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে বঙ্গভবনে কথাগুলো বলেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে সর্বজন গ্রহণযোগ্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। এছাড়া দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে আচার্য হিসেবে যোগদান করেও আত্মসমালোচনা করতে বিন্দু পরিমাণ দ্বিধা করেন না তিনি। নিজের যোগ্যতা নিয়ে এমন সরল ও সৎ স্বীকারোক্তি এবং প্রশ্ন তুলতে পারেন কেবল এমন মানুষ যাঁর সঙ্গে মাটি ও মানুষের আত্মার সম্পর্ক বিদ্যমান। তিনি আমাদের সহজসরল মহামান্য রাষ্ট্রপতি, আমাদের মাটির মানুষ– মোঃ আবদুল হামিদ।

ভাটির শার্দূল খ্যাত মোঃ আবদুল হামিদ ১৯৪৪ সালের ১লা জানুয়ারি কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার কামালপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম হাজী মো. তায়েব উদ্দিন এবং মাতার নাম মরহুমা তমিজা খাতুন। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী উপজেলার নিকলী জিসি হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজ থেকে আইএ ও বিএ ডিগ্রি এবং ঢাকার সেন্ট্রাল ল' কলেজ থেকে এলএলবি ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর তিনি আইন পেশায় নিয়োজিত হন।

হাওরের কাদা-মাটি-জল গায়ে মেখে প্রকৃতি আর মানুষের সঙ্গে মিশে বেড়ে উঠেছেন তিনি। তিনি সবসময় বলেন, 'প্রকৃতিই আমার প্রথম শিক্ষক'। প্রকৃতি, পরিবেশ, মানুষ আর দেশকে ঘিরেই তাঁর চিন্তা-চেতনা ও কাজকর্ম। তিনি মানুষের সঙ্গে মিশতে এবং একসঙ্গে থাকতে খুব পছন্দ করেন। সাধারণ মানুষের খুশিতে তিনি আনন্দিত হন আর দুঃখে তিনি কষ্ট পান।

বিদায়ি রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদকে ২৪শে এপ্রিল ২০২৩ বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট গার্ড অব অনার প্রদান করে –পিআইডি

মানুষের মাঝে থাকতেই তিনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন; এজন্য রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর বিভিন্ন সময়ে তিনি বলেছেন, 'আমার হাত-পা বাঁধা, ইচ্ছা হলেই যেখানে-সেখানে যেতে পারি না'। বড়ো পদ কিংবা দায়িত্ব কোনোটিই তাঁকে তাঁর জন্মস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি, সময় পেলেই নাড়ির টানে ছুটে যেতেন হাওরে। এলাকার মানুষের সুখে-দুঃখে ভাগীদার হয়ে যেতেন– তাই হাওরের মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় 'ভাটির শার্দূল' খেতাবে ভূষিত করেন। রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় হাওর অঞ্চলে সাবমারজিবল রাস্তা তৈরি করে ভাটি এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। একসময় ভাটি অঞ্চলে চলাচলের জন্য রিকশা পাওয়াও দুষ্কর ছিল, এখন সেখানে সরাসরি গাড়ি চলে যায়। ক্রমশ পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে হাওর এলাকা।

বঙ্গভবনে কাজ করার সুবাদে দেখেছি শত প্রটোকলের বাধা উপেক্ষা করে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ হয়ে ওঠেন হাওরের হামিদ ভাই। বঙ্গভবনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের সঙ্গে দেখা করার জন্য এবং তাঁদের আপ্যায়নের খোঁজ নেওয়ার জন্য প্রত্যেক টেবিলে টেবিলে যেতেন। তাঁকে কাছে পেয়ে অতিথিগণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানগুলোতে ভাষণ প্রদানের সময় প্রেস উইং প্রদত্ত লিখিত বক্তব্যের পরে তাঁর নিজস্ব স্টাইলে, আঞ্চলিক সাদামাটা ভাষায় ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে যা বলতেন তা বর্তমান প্রজন্মের মনের কথার সঙ্গে মিলে যেত আর তাই বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে ফেটে পরতো পুরো উপস্থিতি। একজন বাস্তববাদী মানুষ তিনি, যাঁকে কৃত্রিমতা ও অতিরঞ্জনতা কখনো আকৃষ্ট করে নাই আর তাই আমাদের আশপাশে হরহামেশা ঘটে যাওয়া নানান ঘটনা তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে।

তাঁর সরল-সোজা কথাবার্তা মানুষকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করে। সংসদে স্পিকার থাকাকালীন তাঁর কথার ফুলঝুরি আর রসাত্মক উপস্থাপনা ও সংসদ পরিচালনা সংসদকে প্রাণবন্ত করে রাখত। তবে তাঁর স্বভাবসুলভ হাসিঠাট্টার মধ্যেও সংসদ চালাতেন শক্ত হাতে। একইভাবে রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সমাবর্তনে তাঁর সোজাসাপ্টা ও সত্য কথনগুলো মানুষ খুব ভালোভাবে গ্রহণ এবং উপভোগ করে। সমাজের নানাবিধ সমস্যার কথা তিনি খুব সহজেই সাবলীল ভাষায় বলতে পারেন। দেশের শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যাবসা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়গুলো উঠে আসত তাঁর বক্তব্যে। এছাড়া নিজের জীবনের অনেক কিছু তিনি সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ করেন নির্দ্বিধায়। আর এজন্য তিনি অবস্থান নিয়েছেন দেশের মানুষের মনের মণিকোঠায়। তিনি একজন সফল মানুষ, সফল স্বামী, সফল বাবা এবং সর্বোপরি সফল রাষ্ট্রপতি। তিনিই বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রপতি যিনি কোনো ধরনের সমালোচনা ছাড়া পরপর দুইবার পুরো মেয়াদ শেষ করে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রপতি পদ ছেড়েছেন।

স্কুলজীবন থেকেই ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে সম্পৃক্ত হন আন্দোলন সংগ্রামে। বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক মোঃ আবদুল হামিদ রাজনীতিতে সক্রিয় হন বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য ও অনুপ্রেরণায়। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও নীতি ধারণ করেই তিনি সারাজীবন রাজনীতি করেছেন। কোনো ধরনের লোভ-লালসা বা চাওয়া-পাওয়া তাঁকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। আর তাই এই ভাটির রাজা তৃণমূল নেতা থেকে হয়ে উঠেছেন জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতি। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বাস্তবায়ন ও সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন।

তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু ১৯৫৯ সালে তৎকালীন ছাত্রলীগে যোগদানের মাধ্যমে। ১৯৬১ সালে তিনি ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন এবং কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালে তিনি হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট-এর বিরোধিতা করেন এবং ঐ সময় ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেওয়ার কারণে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করে। ১৯৬২-১৯৬৩ সালে তিনি কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ও তাঁর সান্নিধ্যে আসা এবং ধীরে ধীরে বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শের অনুসারী হয়ে ওঠেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তিনি কিশোরগঞ্জে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি পরিচালনা করেন এবং তিনি কিশোরগঞ্জ মহকুমা ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা। এছাড়া তিনি ১৯৬৫-১৯৬৬ সালে কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি এবং ১৯৬৬-১৯৬৭ সালে ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানের কারণে ১৯৬৮ সালে তিনি আবারো কারাবরণ করেন। ১৯৬৯ সালের শেষ পর্যায়ে তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করেন।

জাতীয় সংসদের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে একাদশ জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ তাঁর ভাষণে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ইচ্ছা থাকলেও প্রথমবারে তা হয়নি। পরবর্তী সময়ে খেলোয়াড় কোটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি চূড়ান্ত করি। আগ্রহ নিয়ে সাফল্যের খবরটি বঙ্গবন্ধুকে

জানাতে গেলে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তোর ভর্তি বাতিল, কিশোরগঞ্জ থেকে রাজনীতি করতে হবে।' সেই থেকে তিনি কিশোরগঞ্জের রাজনীতির মধ্যমণি হয়ে ওঠেন। বঙ্গবন্ধু মোঃ আবদুল হামিদের মেধা ও দক্ষতা অনুধাবন করেই মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে ১৯৭০ সালে তাঁকে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে মনোনয়ন প্রদান করেন এবং ১৯৭০-এর সেই নির্বাচনে সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হন। একইভাবে তিনি ১৯৭২ সালে গণপরিষদের সদস্য, ১৯৭৩-২০০৮ পর্যন্ত ছয়বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। সপ্তম সংসদে ডেপুটি স্পিকার পরে স্পিকার, অষ্টম সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা এবং ২০১৩ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন থাকাকালে ১৪ই মার্চ ২০১৩ থেকে মোঃ আবদুল হামিদ ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। ২০শে মার্চ ২০১৩ তারিখে রাষ্ট্রপতি জনাব জিল্লুর রহমান মৃত্যুবরণ করলে তিনি সেদিন থেকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। ২২শে এপ্রিল ২০১৩ তারিখে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং ২৪শে এপ্রিল ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশের ২০তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। মোঃ আবদুল হামিদ ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে ধারাবাহিকভাবে দ্বিতীয় মেয়াদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং ২৪শে এপ্রিল ২০১৮ তারিখে ২১তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে শুধু বাংলাদেশেই নয়, পুরো উপমহাদেশে বিগত ছয় দশকের মধ্যে একমাত্র মোঃ আবদুল হামিদই দুই মেয়াদে দীর্ঘ দশ বছর সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (*দৈনিক যুগান্তর*, ২রা মার্চ ২০২৩)।

তিনি ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। একাত্তরের মার্চের উত্তাল দিনগুলোতে তিনি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে কিশোরগঞ্জে স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠনের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৭ই মার্চ কিশোরগঞ্জ শহরের রথখোলা মাঠে ছাত্র-জনতার সভায় হাজার হাজার লোকের উপস্থিতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করেন।

২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ঐদিন সকালেই স্বাধীনতার ঘোষণা টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়ে সর্বাত্মক মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি বাঙালি সামরিক কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় এপ্রিলের প্রথম দিকে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান-এর কিশোরগঞ্জ, ভৈরব ও বাজিতপুর শাখা থেকে আনুমানিক ১১ কোটি ৭৮ লাখ টাকা সংগ্রহ করে ঐ সময় নিরাপদ স্থান হিসেবে বিবেচিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া ন্যাশনাল ব্যাংক শাখায় জমা রাখেন।

এরপর তিনি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতের আগরতলায় চলে যান। তখন বৃহত্তর চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লা অঞ্চলের অধিকাংশ সংসদ সদস্য সেখানে অবস্থান করেছিলেন। মোঃ আবদুল হামিদ তাঁদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের কৌশলগত বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা ও পরামর্শ করেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ থেকে আগতদের জন্য তিনি ইয়ুথ রিসিপশান ক্যাম্প চালু করেন এবং এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এছাড়া মেঘালয়ে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও শরণার্থীদের ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে গঠিত জোনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল-এর তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি ভারতের মেঘালয়ে রিক্রুটিং ক্যাম্পের চেয়ারম্যান থাকাকালীন তৎকালীন সুনামগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জ জেলা নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (মুজিব বাহিনী) এর সাব-সেক্টরের কমান্ডার পদসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় তিনি এ দায়িত্বে ছিলেন। ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলে তিনি মেঘালয়ে অবস্থানকারী শরণার্থীদের দেশে প্রত্যাবর্তনে উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন ক্যাম্পে সভা করেন। শরণার্থীদের দেশে ফেরা সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি দেশে ফিরে আসেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মোঃ আবদুল হামিদকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৩' প্রদান করা হয়।

স্বাধীনতার পর তিনি কিশোরগঞ্জ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৭৪ সালে তিনি কিশোরগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর ১৯৭৬-১৯৭৮ সালে তৎকালীন সামরিক ও বিএনপি সরকারের সময় তিনি কারারুদ্ধ হন। তিনি ১৯৭৮ সালে থেকে ২০০৯ সালের ২৪শে জানুয়ারি পর্যন্ত কিশোরগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ৫(পাঁচ) বার কিশোরগঞ্জ বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

গণতন্ত্রের প্রতি রাষ্ট্রপতির অগাধ বিশ্বাস ছিল। জাতীয় সংসদের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি হিসেবে মোঃ আবদুল হামিদ তাঁর শেষ ভাষণে বলেন, 'উন্নয়ন ও গণতন্ত্র একসঙ্গে চলে। দেশে গণতন্ত্র অব্যাহত থাকলে উন্নয়ন ও অগ্রগতি এগিয়ে যায়। আবার গণতন্ত্রের স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ হলে উন্নয়নও বাধাগ্রস্ত হয়। উন্নয়নকে স্থায়ী ও টেকসই করতে হলে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মজবুত করতে হবে, তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্রের চর্চা ছড়িয়ে দিতে হবে। গণতন্ত্রহীন অবস্থায় যে উন্নয়ন হয় তা কখনো সার্বজনীন হতে পারে না। সে উন্নয়ন হয় ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক।' তিনি আরও বলেন, 'গণতন্ত্র আমদানি বা রপ্তানিযোগ্য কোনো পণ্য বা সেবা নয়। মনে চাইলো কোনো দেশ থেকে পরিমাণমতো গণতন্ত্র আমদানি

বিদায়ি রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদকে ২৪শে এপ্রিল ২০২৩ বঙ্গভবনে ফুলেল শুভেচ্ছায় বিদায় জানান বঙ্গভবনের কর্মকর্তা-কর্মচারী –পিআইডি

বা রপ্তানি করলাম, বিষয়টি এমন নয়। চর্চার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র বিকশিত ও শক্তিশালী হয়।' একজন বিজ্ঞ রাজনীতিক হিসেবে তিনি যথার্থ বলেছেন যে, চর্চার মাধ্যমেই গণতন্ত্রকে বিকশিত ও শক্তিশালী করতে হয়। আর এই চর্চার মাধ্যমেই পরমতসহিষ্ণুতা, বিরোধী দলকে আস্থায় নেওয়া এবং অন্যকে সম্মান দেওয়ার বিষয়টি নিহিত আছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রপতির এই বোধ ও আশাবাদ দলমতনির্বিশেষে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক, সকলকে অনুপ্রাণিত করুক দেশের উন্নয়নে একযোগে কাজ করতে এটাই সকলের প্রত্যাশা।

তিনি একজন পরোপকারী, বিনয়ী, সদালাপী এবং প্রচারবিমুখ ব্যক্তি। সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সঙ্গে সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী আচার-আচরণের জন্য তিনি সুপরিচিত। তিনি অত্যন্ত সাদামাটা জীবনযাপনে অভ্যস্ত। দরিদ্র জনগণের জন্য রয়েছে তাঁর অকৃত্রিম দরদ ও ভালোবাসা। একজন সমাজসেবক ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক মোঃ আবদুল হামিদ মিঠামইন তমিজা খাতুন গালর্স হাইস্কুল, মিঠামইন হাজী তায়েব উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, মিঠামইন কলেজসহ এলাকায় প্রায় ৭৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৪টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ৩টি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

যে-কোনো দেশের জন্যই রাষ্ট্রপতি খুবই মর্যাদা আর গুরুত্বপূর্ণ পদ। বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধান অনুযায়ী আমাদের দেশে রাষ্ট্রপতি হলেন রাষ্ট্রের প্রথম নাগরিক এবং সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। সংসদীয় পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যপরিধি আলংকারিক হলেও জাতির ক্রান্তিকালে দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার ভরসাস্থল হয়ে ওঠেন রাষ্ট্রপতি। দেশের প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি তাঁর মেধা, প্রজ্ঞা, বিবেক ও বুদ্ধি-বিবেচনার মাধ্যমে জাতিকে সঠিক পথের দিশা দেখাবেন– এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা (*দৈনিক যুগান্তর*, ২রা মার্চ ২০২৩)। তাই রাষ্ট্রপতিকে হতে হয় সর্বজনবিদিত ও সকলের আস্থাভাজন। রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ এমনি একজন ব্যক্তিত্ব যাঁকে দলমতনির্বিশেষে সকলে ভালোবাসে, তিনি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। সাদামাটা অনাড়ম্বর জীবনযাপন করা আবদুল হামিদের দেশপ্রেম, সততা, সরলতা ও আন্তরিকতা দেশবাসীর হৃদয়কে স্পর্শ করেছে– আর তাই তৃণমূল থেকে রাজনীতির অলিগলি ও বিভিন্ন স্তর পাড়ি দিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন জনগণের রাষ্ট্রপতি।

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সবসময় আবদুল হামিদের মতো রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন, যিনি সহজে মানুষের সঙ্গে মিশতে পারেন আবার প্রয়োজনে প্রস্তর কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে সফল রাষ্ট্রপতি হিসেবে মোঃ আবদুল হামিদের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। রাষ্ট্রপতি পদ থেকে অবসর নিলেও মানুষের হৃদয়ে রাজত্ব করবেন ভাটির রাজা– মোঃ আবদুল হামিদ।

তথ্যসূত্র

১। মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের জীবন বৃত্তান্ত

২। জাতীয় সংসদের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে একাদশ জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের ভাষণ

৩। মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত ভাষণ সংকলন *'স্বপ্ন জয়ের ইচ্ছা'*

৪। হাওর থেকে বঙ্গভবন, ওবায়দুল কবির, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৯শে মার্চ ২০২৩

৫। দেশের ইতিহাসে দীর্ঘমেয়াদি রাষ্ট্রপতি, বিমল সরকার, *দৈনিক যুগান্তর*, ২রা মার্চ ২০২৩

মুহা. শিপলু জামান: উপপ্রেস সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা

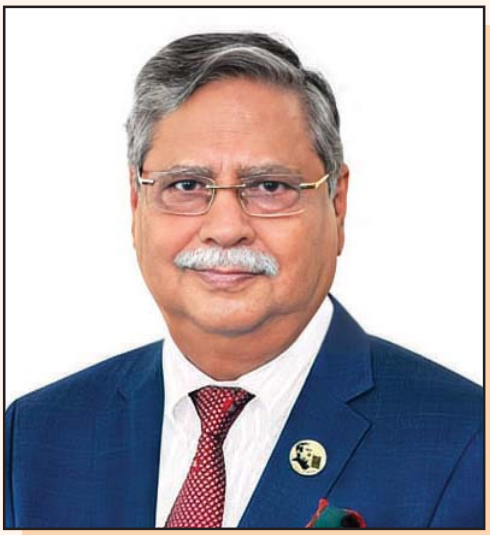

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন নিভৃতচারী বঙ্গবন্ধু অন্তপ্রাণ

ড. মিঠুন মোস্তাফিজ

> সব মানুষই চায় তার জীবদ্দশায় একটি উদাহরণ স্থাপন করতে। আর প্রকৃতির নিয়মে পৃথিবী থেকে প্রস্থানের পর ইতিহাসের অনুপ্রেরণা হতে। –উইলিয়াম ম্যাককিনলে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট

কেন এই উক্তি দিয়ে লেখাটি শুরু করলাম– পাঠক মনে এমন প্রশ্ন জাগতেই পারে। কৌতূহলী মন তখনই তৃপ্ত হয়, যখন বাঞ্ছিত উত্তর মেলে। আশা করি, এক নিশ্বাসে লেখাটি পড়বার পর পাঠক মনে শুধু উত্তর নয়, যথারীতি বিশ্লেষণ করবার সক্ষমতা তৈরি হবে। যাই হোক, মূল আলোচনায় যাবার আগে চলুন সংশ্লিষ্ট খবরটি আরও একবার আওড়ে নেই। দেশের ২১তম মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ অ্যাডভোকেট দুদফায় সফলভাবে দায়িত্ব পালন শেষে ২৩শে এপ্রিল অবসরে যাচ্ছেন। যারা চলতি ঘটনাবলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তারা এবং সচেতন নাগরিকসমাজের কাছে খবরটি অনেক আগেই জানা। আমরা আরও জানি যে, বিদায়ি রাষ্ট্রপতি ছিলেন জাতির অভিভাবক ও প্রথম নাগরিক, যিনি ছিলেন বঙ্গভবনের ১৭তম ব্যক্তি; বাসিন্দা। এর মধ্যে বিদায়ি রাষ্ট্রপতি তাঁর বর্ণাঢ্য জীবদ্দশায় যে সুবিস্তৃত কর্মযজ্ঞ ও ভূমিকা রেখেছেন, বাঙালি জাতির কাছে তা যে অনন্য উদাহরণ হিসেবে স্থাপিত হয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না।

মূল লেখাটি আসলে তাঁকে ঘিরে যিনি আমাদের জাতীয় জীবনে উদাহরণ স্থাপন করতে চান এবং অনুপ্রেরণার উৎস হতে চান, বিদায়ি রাষ্ট্রপতির ধারাবাহিকতায়। খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এটুকু বলার কারণ হলো– জাতীয় জীবনের একটি পর্যায়ে ক্ষণকাল তাঁর নেতৃত্বে আমার কাজ করার কিছুটা সুযোগ হয়েছে। কর্ম, গুণ, ব্যক্তিত্ব ও দায়িত্বশীলতা নিয়ে তাঁর জীবনের কোনো পর্যায়েই কেউ প্রশ্ন করবার সুযোগ পায়নি বলেই আমার জানা। পাঠক হয়ত ধারণা করতে পেরেছেন, আমি বলছি, আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি (নির্বাচিত) মোঃ সাহাবুদ্দিনের কথা।

রাষ্ট্র পরিচালনার ধারাবাহিকতায় ২৪শে এপ্রিল পূর্ণ রাষ্ট্রাচার ও রীতি অনুযায়ী বঙ্গভবন নতুন অভিভাবককে স্বাগত জানিয়েছে। দেশমাতৃকার সেবায় নিয়োজিত হতে এদিন ২২তম মহামান্য রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন রাষ্ট্রপতি (নবনির্বাচিত) জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিন। তিনি হলেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ এ পদে আসীন হওয়া ১৮তম ব্যক্তি। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়নে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন তিনি। প্রজ্ঞাপন জারি করে নির্বাচন কমিশন।

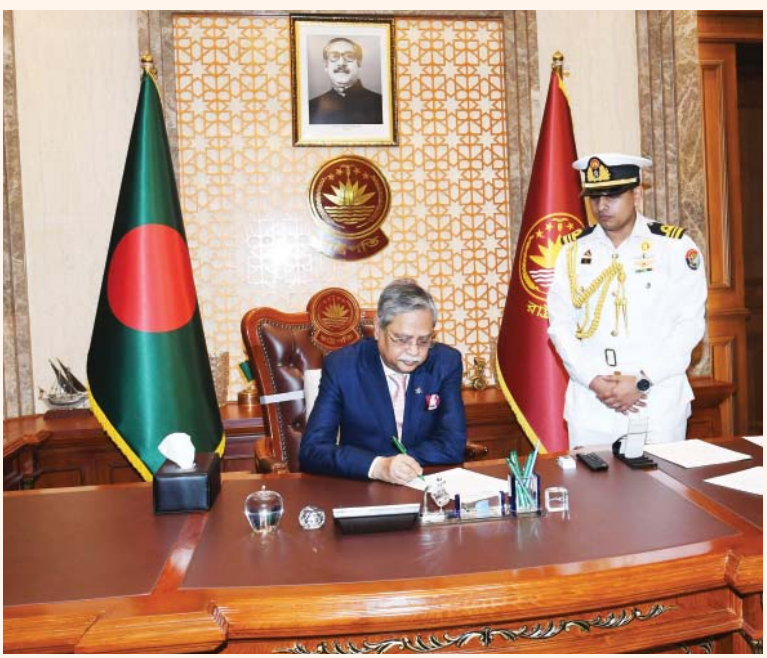

নবনিযুক্ত রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ২৪শে এপ্রিল ২০২৩ বঙ্গভবনে অফিস করেন –পিআইডি

নতুন রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে যখন লিখছি, তখন লোকযুদ্ধ বিষয়ক একজন ক্ষুদ্র গবেষক হিসেবে আমার একটি বিষয় বার বার মনে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। ইতিহাস পাঠের মতোই মানসপটে ভেসে উঠছে, ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মেহেরপুরের ভবেরপাড়ার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের প্রথম সরকার 'মুজিবনগর সরকার' গঠিত হয়েছিল। যে সরকারের শপথ গ্রহণ সম্পন্ন হয় সপ্তাহ বাদে ১৭ই এপ্রিল। বাংলাদেশের সরকার গঠন, রাষ্ট্র পরিচালনা এবং নেতৃত্বের সঙ্গে মাস হিসেবে এপ্রিলের একটি ঐতিহাসিক মর্মার্থ বিদ্যমান বটে!

বিষয়টি কাকতালীয় হলেও ৫২ বছরের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এই এপ্রিলেই বঙ্গভবন পেয়েছে এক নতুন অভিভাবক। যিনি এই নতুন অভিভাবক তাঁর সম্পর্কে আমরা আসলে খুব বেশি কিছু জানি কি?

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বাঙালি জাতির সূর্য সন্তান, একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। একাত্তরের উত্তাল সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

বঙ্গভবনের দরবার হলে ২৪শে এপ্রিল ২০২৩ শপথবাক্য পাঠ শেষে নতুন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনকে অভিনন্দন জানান বিদায়ি রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ –পিআইডি

রহমানের মুক্তির সংগ্রামের সর্বজনীন উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে আনার মরণপণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন একাত্তরের রণাঙ্গনে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পড়ুয়া টগবগে তরুণ মোঃ সাহাবুদ্দিন। দেশমাতৃকাকে শত্রুমুক্ত করতে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন পাকিস্তানি হায়েনাদের বিরুদ্ধে। ১৯৭১ সালের ৯ই এপ্রিল তিনি ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে নিজ জেলা পাবনার বিভিন্ন অঞ্চলে পাকিস্তানি হানাদারদের মোকাবিলা করেন।

ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতি ও সংগ্রামী জীবনের হাতেখড়ি মোঃ সাহাবুদ্দিনের। ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন পাবনা জেলার স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক। বাঙালি জাতির কলঙ্কিত অধ্যায় ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যার পর প্রতিবাদী যুবক সাহাবুদ্দিনকে সেসময় দীর্ঘ তিন বছর কারাভোগ করতে হয়।

রক্তস্রোতে জন্ম নেওয়া একটি দেশের এক চরম অস্থির সময়ে আন্দোলন আর সংগ্রামী জীবনের সাক্ষী হয়ে প্রতিটি মুহূর্তের সাথে যুদ্ধ করেছেন মোঃ সাহাবুদ্দিন। রেখেছেন মেধার স্বাক্ষর। নিজেকে মেলে ধরেছেন প্রতিকূলে, প্রমাণ করেছেন প্রতিটি বৈরী পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে যেন তিনিই সেরা। জেল থেকে বেরিয়ে পড়ালেখা শেষ করে যোগ্যতার স্বাক্ষর থেকে বিসিএস জুডিসিয়াল সার্ভিসে যুক্ত হন তিনি। কর্মজীবনে যাঁর সততা, দক্ষতা ও সুনাম সর্বজনবিদিত। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর দায়িত্ব পালন আজ নিষ্ঠা ও সম্মানের দৃষ্টান্ত হিসেবে আলোচিত।

অস্থি-মজ্জায় বঙ্গবন্ধুর আদর্শের একজন নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক, ত্যাগী কর্মী, রাজনৈতিক নিপীড়নের শিকার, ঝঞ্ঝার মাঝেও যিনি স্থিরচিত্ত ও মননের, তিনিই মিতভাষী ও মিষ্টি হাসির একজন ব্যতিক্রমী নিভৃতজন মোঃ সাহাবুদ্দিন।

যিনি নিজেকে পরিচিত করাতে মিডিয়ার পেছেনে ছোটেননি বিরামহীন অহর্নিশ। তাঁকে নিয়ে গণমাধ্যম কিংবা আমরা সাধারণ মানুষ কখনও ভেবেছি বলে জোর গলায় বলতেও পারব না। তবে হ্যাঁ, তাঁকে নিয়ে ভেবেছেন তিনি, যাঁর ভাববার কথা। যিনি ১৭ কোটি মানুষকে নিয়ে ভাবেন। তাদের খাবার, নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা নিয়ে ভাবেন তিনি। তিনি হলেন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের মানুষ যা চিন্তার সাহস করে না, এমনকি ভাবনার পরিসরে আনবার ধৃষ্টতাও দেখায় না, তা বাক্সের বাইরে ছক কষে মানব মনে নতুন ভাবনা ও মূল্যায়নের বীজ বুনে দেবার ক্ষমতা রাখেন এই একজনই; জাতির আশা-ভরসার কেন্দবিন্দু, জাতির পিতার যোগ্য উত্তরসূরি, গণতন্ত্রের মানসকন্যা, প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ-এর সভাপতি শেখ হাসিনা। তাঁর ও তাঁর দলের সুবিবেচিত সিদ্ধান্তের ফলেই বঙ্গীয় বদ্বীপে দেখা মেলে একেকজন নিভৃতচারী ও জীবনব্যাপী পরীক্ষিত বঙ্গবন্ধু অন্তপ্রাণ মোঃ সাহাবুদ্দিনের, মহামান্য ২২তম রাষ্ট্রপতি (নির্বাচিত)। এমন নিখাদ হীরক খণ্ড খুঁজে পাবার যোগ্যতা কোনো সাধারণ মানুষের সাধ্যসীমার ভেতরে থাকবার কথা নয়, তাও সত্য! স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতেগড়া রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। গণমানুষের এই দলটি দেশের কর্ণধার তাঁকেই নির্বাচিত করবে, যাঁর হাতে দেশের মানুষ সার্বভৌমত্ব, সংবিধান, গণতন্ত্র ও সুশাসন নিশ্ছিদ্র নিরাপদ। নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সেই যোগ্য সুজন যিনি ৫২টি বছর ধরে দেশের সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে দেশপ্রেমের প্রতিটি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে আজকের অবস্থানে আসীন হয়েছেন বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশে।

নতুন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনকে ২৪শে এপ্রিল ২০২৩ বঙ্গভবনে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা –পিআইডি

ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশ। অদম্য শক্তিতে, দুরন্ত-দুর্বার গতিতে উন্নয়ন-সমৃদ্ধি আর প্রগতির মিশেলে বিশ্বসভায় স্মার্ট বাংলাদেশ ভাস্বর হবে, নবনির্বাচিত মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুযোগ্য অভিভাবকত্বে– এ প্রত্যাশা নিশ্চয়ই যৌক্তিক। কেননা, শিক্ষা, রাজনীতি ও পেশাগত জীবনে তিনি তাঁর নেতৃত্বের সাফল্য প্রমাণ করে এসেছেন প্রতিটি স্তরে। তাঁর পেশাগত জীবন রেখা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ১৯৮২ সালে বিসিএস বিচার বিভাগে যোগদান করে ১৯৯৫ সালে জুডিসিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব নির্বাচিত হন মোঃ সাহাবুদ্দিন। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক কো-অর্ডিনেটর নিযুক্ত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ২০০১ সালে সাধারণ নির্বাচন পরবর্তী বিএনপি-জামায়াত জোটের নেতাকর্মীদের সংগঠিত হত্যা, লুণ্ঠন এবং মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড অনুসন্ধানে দ্রুত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটিরও চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

বিচারিক কাজের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ মোঃ সাহাবুদ্দিন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক হিসেবে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাসহ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের ডেস্ক অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ২০১১ সালে তিনি দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার নিযুক্ত হন এবং সফল দায়িত্ব পালন শেষে ২০১৬ সালে অবসরে যান। একজন বঙ্গবন্ধু অন্তপ্রাণ হিসেবে তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে সফল দায়িত্ব পালন এবং কোনো সমালোচনা ছাড়া সেই সকল দায়িত্ব সুসম্পন্ন করে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

জীবনরথে আইন মান্য এবং সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করাই যেন তাঁর ব্রত। হয়ত এজন্যই ১৯৮০ সালে আইন পেশায় আসা তাঁর। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮২ সালে বিসিএস (বিচার) ক্যাডারে মুন্সেফ (সহকারী জজ) পদে নিয়োগ লাভ করেন তিনি। মহতী এই কর্মের ধারাবাহিকতায় মোঃ সাহাবুদ্দিন ছিলেন যথাক্রমে যুগ্ম জেলা জজ, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ এবং জেলা ও দায়রা জজ। ২০০৬ সালে আনুষ্ঠানিক বিচারিক জীবন থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবনেও বৈচিত্র্য রয়েছে তাঁর। পাবনার রাধানগর মজুমদার একাডেমি থেকে ১৯৬৬ সালে এসএসসি পাসের পর তিনি ভর্তি হন ঐতিহ্যবাহী এডওয়ার্ড কলেজে। ১৯৬৮ সালে সেখান থেকে এইচএসসি এবং ১৯৭১ সালে (১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত) বিএসসি পাস করার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৪ সালে মনোবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন মোঃ সাহাবুদ্দিন। এরপর পাবনা শহীদ অ্যাডভোকেট আমিনুদ্দিন আইন কলেজ থেকে ১৯৭৫ সালে তিনি এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন ।

সংগ্রাম, ত্যাগ, তিতিক্ষা আর ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মোঃ সাহাবুদ্দিন বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের অধিকারী হলেও তা আলোচনায় এসেছে খুবই কম। ১৯৬৬ সালে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজেই রাজনীতির হাতেখড়ি তাঁর। অবশ্য এর আগেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে পাবনায় দেখা হয় মোঃ সাহাবুদ্দিনের। ছাত্রলীগের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর তিনি এডওয়ার্ড কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং অবিভক্ত পাবনা জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি থেকে ১৯৬৬ সালে সভাপতি হন। ছয় বছর এ পদে দায়িত্ব পালন শেষে ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় কাজের ধারাবাহিকতায় ১৯৭৪ সালে পাবনা জেলা যুবলীগের সভাপতি হন তিনি। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়। কারামুক্তির পর তিনি পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব পান।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার আগ পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর একজন সদস্য। দলটির ২২তম জাতীয় সম্মেলন প্রস্তুতির জন্য গঠিত প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটির চেয়ারম্যান এবং জাতীয় কাউন্সিলের নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মোঃ সাহাবুদ্দিন। দলটির প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি।

মোঃ সাহাবুদ্দিন ১৯৪৯ সালের ১০ই ডিসেম্বর পাবনা জেলার সদর উপজেলার জুবিলি ট্যাঙ্কপাড়ায় (শিবরামপুর) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা শরফুদ্দিন আনছারী ও মা খায়রুন্নেসা। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক পুত্র সন্তানের পিতা। তাঁর স্ত্রী অধ্যাপক ড. রেবেকা সুলতানা প্রজাতন্ত্রের সাবেক যুগ্মসচিব।

লেখাটি শুরু করেছিলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২৫তম প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম ম্যাককিনলের একটি উক্তি দিয়ে। ১২৫ বছর পর তাঁর সেই উক্তিটি বোধ করি যথার্থই। সত্যিই তো! সব মানুষই চায় তার জীবদ্দশায় একটি উদাহরণ স্থাপন করতে। আমি বিশ্বাস করি, সংগ্রামী জীবনের কঠিন সব বাঁকের পরীক্ষায় সফলকাম হয়ে রাষ্ট্রপতি (নির্বাচিত) মোঃ সাহাবুদ্দিন সেই উদাহরণ স্থাপন করতে পেরেছেন। নিভৃতচারী হলেও দেশপ্রেম আর দেশাত্মবোধের পরীক্ষায় তিনি আলোকবর্ষ সমান বিকিরিত।

অভিনন্দন, মহামান্য রাষ্ট্রপতি।

ড. মিঠুন মোস্তাফিজ: বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, সাংবাদিক ও গবেষক

শপথ নেবার মাহেন্দ্রক্ষণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার '৭১

জাফর ওয়াজেদ

মুজিবনগর সরকার, প্রবাসী সরকার বা অস্থায়ী সরকার, কিংবা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার– যে নামেই ডাকা হোক বা পরিচিতি পেয়ে থাক, বাহান্ন বছর আগে জাতির জীবনমরণ সন্ধিক্ষণে, অস্তিত্ব ধ্বংসায়োজনের মুহূর্তে সাহসিকতা ও বীরত্বের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছিল বাঙালির স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। হানাদার কবলিত দেশকে সশস্ত্র লড়াই, রক্ত আর প্রাণের বিনিময়ে মুক্ত করেছে। হাজার বছর ধরে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, শোষিত, নিপীড়িত, ঘুমন্ত ও পশ্চাৎপদ জাতিকে সশস্ত্র সংগ্রামের ভেতর দিয়ে যুদ্ধ জয়ের নিশানায় পৌঁছে দিয়েছিল সাড়ে সাত কোটি মানুষের সমর্থিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সেই একাত্তর সালে।

বাহান্ন বছর আগে যখন পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী নির্বিচারে গণহত্যা চালায় বাংলাদেশজুড়ে, প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তিকামী বাঙালি আধুনিক সমরাস্ত্র সজ্জিত বাহিনীর বিরুদ্ধে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে, গ্রেপ্তার হওয়ার আগে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দুদফায় দুটি বার্তায় এই ঘোষণা দেওয়া হয়। সত্তরের নির্বাচনে জনগণের বিপুল ভোটে বিজয়ী আওয়ামী লীগ নেতারা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে মুক্তাঞ্চলে জমায়েত হন। বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা গণপরিষদ সদস্যরা ১০ই এপ্রিল একত্রিত হন। তাজউদ্দীন আহমদ ৩রা এপ্রিল দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর উপদেষ্টাদের সঙ্গে বৈঠক করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহায়তা কামনা করেন। ১০ই এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদ গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। প্রায় দুশো জন এমএনএ এবং এমপিএ এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। মুজিবনগর সরকারের প্রথম কেবিনেট সচিব এইচ টি ইমাম কুষ্টিয়া জেলা সীমান্তে এই অধিবেশন বসার উল্লেখ করেছেন, 'অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে মুক্তিযুদ্ধ ও সরকার পরিচালনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। এই মন্ত্রিপরিষদ এবং এমএনএ ও এমপিএগণ ১০ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করেন।'

বাঙালির প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম সরকার। এই বৈঠকেই বঙ্গবন্ধুর ২৬শে মার্চ ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাসহ স্বাধীনতার সনদপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা ও অনুমোদন করা হয়। দেশের নামকরণ করা হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। এর পরদিন জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বলেছিলেন, যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে না বলে স্থির বিশ্বাস। বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার আহ্বান জানান তিনি। সরকার গঠনের পর শপথ গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করা হয় ১৭ই এপ্রিল। সেদিন বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচিত হয়েছিল। অসংখ্য সাংবাদিক, বেতার-টিভি প্রতিনিধি, আমন্ত্রিত অতিথি এবং ব্যাপক জনসমাগমের মধ্যে প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ শপথ নিয়েছিলেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করা হয়। এই ঘোষণার ভিত্তিতে বাংলাদেশের সংবিধান পরবর্তীকালে রচিত হয়। কেবিনেট সচিব এইচ টি ইমামের মতে, 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র হলো আমাদের ম্যাগনাকার্টা, স্বাধীনতার সনদ। এই ঘোষণায় সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে কেন, কোন ক্ষমতা বলে এবং পরিস্থিতিতে একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হলো, যে রাষ্ট্রের নাম হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। যেহেতু এই সরকার মুজিবনগরে তার প্রধান দপ্তর স্থাপন করেছিল তাই এর ব্যাপক পরিচিতি হলো মুজিবনগর সরকার রূপে। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে এই সরকারের প্রধান কার্যালয় কলকাতায় স্থাপন করা হয় প্রধানত নিরাপত্তা এবং মুক্তিযুদ্ধে নির্বিঘ্নে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রয়োজনে।' বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক, সাংবিধানিক, সর্বোপরি শাসনতান্ত্রিক রূপরেখাও বিধৃত হয়েছে এই সনদপত্রে। আর এই সনদপত্রের ভিত্তিতেই সরকার গঠিত হয়েছে। যার ছিল আইনানুগ বৈধতা। কারণ এই সনদপত্রে জনগণের অভিপ্রায় উঠে এসেছে। যে জনগণ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করেছে ব্যালটের মাধ্যমে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে মোনাজাত করছেন এম. মনসুর আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদ

নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে সত্তরের নির্বাচনে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্যদের নিয়েই বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়। বৈধভাবে গঠিত বলেই এই সরকার আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পায়। বিদেশি রাষ্ট্রগুলো এই সরকারকেই স্বীকৃতি দেয়। আর এই সরকারের ভিত্তিই ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ২৬শে মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা। যা ১৭ই এপ্রিল বিশ্ববাসীর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে ধরা হয়েছিল। এই ঘোষণার ভিত্তিতেই সাড়ে সাত কোটি মানুষ রণাঙ্গনে নেমেছিল, শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে দেশের প্রতিটি ইঞ্চি মাটিকে স্বাধীন ও নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে। এই চেতনা মানুষের মধ্যে গড়ে তুলেছিলেন বঙ্গবন্ধু। প্রথম সরকারের রাষ্ট্রপতি। যিনি পাকিস্তানের ২৩ বছরের ইতিহাসে জেল-জুলুম, নির্যাতন, হুলিয়া, মৃত্যুদণ্ড, ফাঁসির মঞ্চ পেরিয়ে জাতিকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে। এক সময় আঘাত আসে আর প্রত্যাঘাতে বঙ্গবন্ধু জাতিকে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। আর পুরো নয় মাস বাঙালি জাতি শেখ মুজিবের নামে, তাঁরই নির্দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আত্মদান করেছিল।

একাত্তরের ৭ই মার্চের ভাষণের দিক নির্দেশনা ও ২৬শে মার্চের বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার ভিত্তিতে বাঙালি প্রতিরোধ যুদ্ধে নেমেছিল। যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা অবশ্য করেছিল। সেই পথ ধরেই ১০ই এপ্রিল সরকার গঠন আর ১৭ই এপ্রিল সেই সরকারের শপথ গ্রহণ– বাঙালির ইতিহাসের এক যুগান্তক্ষণ। ১৭ই এপ্রিলের সকালে মুজিবনগরে থোকা থোকা ধরে থাকা আমের গাছের নীচে মঞ্চে দাঁড়িয়ে শপথ পাঠ করেন মন্ত্রিপরিষদ সদস্যরা। জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। স্থানীয় লোকজন অনুষ্ঠান আয়োজনে ছিল সহায়ক। তারাই মঞ্চের জন্য বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল সরবরাহ করেছিল।

শপথ গ্রহণ শেষে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেছিলেন, 'পৃথিবীর মানচিত্রে আজ যে নতুন রাষ্ট্রের সূচনা হলো তা চিরদিন থাকবে। পৃথিবীর কোনো শক্তি তা মুছে দিতে পারবে না।' না পারেনি। তাই আজ বাহান্ন বছর পরও স্মরণ করা যায়, সেদিনের সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত ও তার আবেদন। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তাঁকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করতে হয়। ব্যাখ্যা হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, 'আপনারা জানেন, পাকিস্তানের শোষণ এবং শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গত ২৩ বছর ধরে বঙ্গবন্ধু সর্বস্বার্থ পরিত্যাগ করে আন্দোলন করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার। আমি জোর দিয়ে বলছি, তিনি আমাদের মধ্যে আছেন। জাতির সংকটের সময় আমরা তাঁর নেতৃত্ব পেয়েছি। ...আমাদের রাষ্ট্রপতি জনগণ-নন্দিত ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, নির্যাতিত মানুষের মূর্ত প্রতীক শেখ মুজিব। বাংলার মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করে আজ বন্দি। তাঁর নেতৃত্বে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম জয়ী হবেই।' এই আশার বাণী আলোকিত মহিমা হয়ে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে।

একাত্তরের ১৭ই এপ্রিল যে সাহস, যে উদ্যম, যে মনোবল নিয়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সরকার গঠন করেছিলেন, তার দ্বিগুণ মনোবল নিয়ে তা পরিচালনা শুধু নয়, বিশ্ব জনমতও তৈরি করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। মুক্তিবাহিনী সংগঠিত করে যুদ্ধ পরিচালনা এবং স্বল্প সময়ে দেশকে হানাদারমুক্ত করেছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো দেশ যুদ্ধ করে এত স্বল্প সময়ে দেশকে স্বাধীন করতে পারেনি।

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের আম্রকাননে বাঙালি নামে একটি নতুন জাতি বিশ্ব জাতিসভায় আসন নিলো জন্মের সাথে সাথেই। সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেছেন, 'বিগত বহু বৎসর যাবৎ বাংলার মানুষ, তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, নিজস্ব ঐতিহ্য, নিজস্ব অধিকার নিয়ে এগুতে চেয়েছেন, কিন্তু পাকিস্তানি কায়েমী স্বার্থ কখনই তা হতে দিল না। ওরা আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। আমরা নিয়মতান্ত্রিক পথে এগুতে চেয়েছিলাম, ওরা তা দিল না। ওরা আমাদের ওপর বর্বর আক্রমণ চালাল। তাই আজ আমরা লড়াইয়ে নেমেছি।' দেশজুড়ে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা তখন পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধে সক্রিয়। বহু এলাকায় হানাদারবাহিনী তখনও অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। মুক্তাঞ্চলে সংগঠিত হচ্ছিল সামরিক, বেসামরিক বাঙালিরা। শপথকালে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি অত্যন্ত আশাবাদী বলেই দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, 'এ লড়াইয়ে আমাদের জয় অনিবার্য। আমরা পাকিস্তানি হানাদারদের বিতাড়িত করবোই। আজ না জিতি কাল জিতব। কাল না জিতি পরশু জিতবই। আমরা বিশ্বের সব রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চাই। পরস্পরের ভাই হিসেবে বসবাস করতে চাই। মানবতার, গণতন্ত্রের এবং স্বাধীনতার জয় চাই।' স্বাধীনতা অবশ্যই এসেছিল এবং তাঁদের নেতৃত্বেই। তাঁরা ১৭ই এপ্রিল শপথ নিয়ে জনগণকে দেওয়া অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে পালন করেছেন। আর এই কাজে দেশ ও জাতীয় নেতাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে ছিলেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা। প্রথম সরকারের প্রথম কেবিনেট সচিব এইচ টি ইমাম মূল্যায়ন

করেন, '...কী অসাধারণ নেতৃত্বে অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন এই সরকার, তাও মাত্র নয় মাস সময়ে। অবশ্যই এটি সম্ভব হয়েছিল দেশপ্রেম ও গণসমর্থনের কারণে। কোনো দেশের জনগণের এত বড়ো অংশকে এমন ব্যাপকভাবে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যায়নি। এই দেশপ্রেম, ত্যাগ, মুক্তি কামনাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করে দেশ ও বিদেশে সমর্থনের ব্যবস্থা করে স্বাধীনতা অর্জন করাই ছিল আমাদের বিপ্লবী প্রবাসী সরকারের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব। ...সরকারে আকারে বিশাল ছিল না; কিন্তু অত্যন্ত কার্যকর এবং দক্ষ ছিল।' বাহান্ন বছর আগে গঠিত বাঙালির প্রথম সরকারের একটাই লক্ষ্য ছিল যুদ্ধে জয়লাভ করা। অর্থাৎ বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ হানাদারমুক্ত করা এবং সেই লক্ষ্যেই তাঁরা তাঁদের সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। প্রচুর প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। শেষতক বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন।

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল বিশ্ববাসীর উদ্দেশে দেওয়া বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বলেছিলেন, 'লাশের পাহাড়ের নীচে পাকিস্তান আজ মৃত ও সমাহিত।' এই সরকারের লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা অর্জন এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তি সাধন। সেই লক্ষ্য থেকে সরকার কখনও বিচ্যুত হয়নি। সেই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে আট মাসে সরকারের নেতৃত্বে যা অর্জিত হয়েছিল, তা অসামান্য। এই সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. আনিসুজ্জামানের মতে, বাংলাদেশের সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্গঠন, রণাঙ্গনের বিভিন্ন সেক্টর ও ফোর্সের বিন্যাস, সামরিক নেতৃত্বের পূর্বাপর ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা একদিকে, অন্যদিকে সরকারের বেসামরিক সংগঠন, বেসামরিক অঞ্চল গঠন ও সেখানে প্রশাসন গড়ে তোলা, যুব ক্যাম্প গঠন, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে পরামর্শক কমিটির প্রতিষ্ঠা, ভারত সরকারের সাহায্য নিয়ে প্রায় এক কোটি শরণার্থীর দেখাশোনা, কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো এবং যৌথ সামরিক কমান্ড গঠন, প্রবাসী বাঙালিদের সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন দেশে মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে জনমত গঠন, বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণাকারী কূটনীতিবিদদের ব্যবস্থা করা, কলকাতায় বাংলাদেশের মিশন স্থাপন, দিল্লি ও অন্যত্র বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা, মুক্ত এলাকায় বেসামরিক প্রশাসন চালানো, স্বাধীন বাংলা বেতার পরিচালনা ও সরকারি মুখপত্রের প্রকাশনা, পরিকল্পনা কমিশন গঠন ইত্যাদি। অনেক বিরূপ প্রচার চলেছে সরকারের বিরুদ্ধে, তাছাড়া সরকারের মধ্যেই ষড়যন্ত্রকারী ছিল। তারা চেয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে আপোশরফা করতে। এমন প্রয়াস বন্ধ করতেও সরকারের শক্তি ও সময়ের অপচয় হয়। ভারতের ওপর নির্ভরশীল হয়েও একটা সম্মানজনক অবস্থা থেকে ভারত সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালানোও সামান্য কাজ ছিল না।

শপথের পর উপস্থিত দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের জন্য প্রদত্ত বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বলেছিলেন, ইয়াহিয়া খান তথা পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের রক্ত দিয়ে ধ্বংসের ইতিহাস লিখেছে। গণহত্যা চালাচ্ছে এবং পরাজয় নিশ্চিত জেনে 'পোড়া মাটি' নীতি অনুসরণ করছে। তাজউদ্দীন আহমদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, স্বাধীন বাংলাদেশ আজ বাস্তব সত্য এবং এ সম্বন্ধে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর মনে যেন কোনো সন্দেহ না থাকে। সাড়ে সাত কোটি বীর বাঙালি আজ তাদের স্বাধীন সার্বভৌম সত্তা প্রতিষ্ঠা করেছে এবং যে-কোনো মূল্যে তা রক্ষা করবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সৃষ্ট স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে স্থাপিত হয়েছে এবং কোনো শক্তিই আর তা মুছে ফেলতে পারবে না। তিনি জোরালো ভাষায় রুশ, আমেরিকা, চীন, ভারতসহ বিশ্বের ছোটোবড়ো সব দেশের সরকার ও জনগণের কাছে সাড়ে সাত কোটি নিরস্ত্র বাঙালির মরণপণ স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানালেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর ঘোষণায় আরও বলেন, বাংলাদেশ কোনো জোটভুক্ত হবে না এবং প্রকৃত গণতন্ত্র হবে বাংলাদেশের মূল রাষ্ট্রীয় নীতি। নবজাত এই রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দানের জন্য তিনি বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানান। সেই সাথে সাড়ে সাত কোটি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বললেন যে, 'জাতি আজ দৃঢ়প্রত্যয়ের সাথে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর নৃশংসতম তৎপরতা প্রতিরোধ করছে এবং শত্রু পরাজিত ও বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের যুদ্ধ চলবে।'

বাহান্ন বছর পর একাত্তরের ১৭ই এপ্রিল শপথ নেওয়া সরকারের পরবর্তী কার্যক্রম মূল্যায়নে স্পষ্ট হয়, বাঙালি জাতির প্রথম সরকার বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং বাঙালি জাতিকে ঠাঁই করে দিয়েছে কেবল নয়, একটি আনুষ্ঠানিক সমরসজ্জার সামরিক বাহিনী, পেছনে যার মার্কিন ও চীন সমর্থন নিয়ে দণ্ডায়মান, সেই সরকারের লক্ষাধিক সেনার বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই করতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিল প্রথম সরকার। এই সরকারের পথ ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির দিগন্ত তৈরি। বিজয়ের সাড়ে তিন বছরের মাথায় ৬ সদস্যের সরকারের ৫ জনই নির্মমভাবে নিহত হন অপর সদস্যের পরিকল্পনা, পরিচালনায়– যিনি স্বাধীনতা নয়, পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন চেয়েছিলেন যুদ্ধকালে। এই সদস্যকে কেন্দ্র করে মুজিবনগর সরকারের ভেতর একটি চক্র গড়ে ওঠে। এরা মার্কিন-পাকিস্তান মদদপুষ্ট হয়ে একাত্তরে স্বাধীনতার সংগ্রামকে ভ্রান্ত পথে নেওয়ার তৎপরতা চালায়। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে এই চক্র আঘাত হানে বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ওপর। সপরিবার নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। পঁচাত্তরের ৩রা নভেম্বর জেলখানায় হত্যা করা হয় সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এএইচএম কামারুজ্জামান এবং ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলীকে। এঁরাই ছিলেন একাত্তরে বাঙালি জাতির কর্ণধার। পরাজিত শক্তি তাঁদের উপর আঘাত হানে। ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর দিবসে তাঁদের কথা মনে আসে বেশি।

একাত্তরের ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ও শপথ গ্রহণ যুদ্ধরত বাঙালির জীবনে স্বাধীনতা ও মুক্তির স্বপ্ন বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করেছে। মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে বাঙালি তার স্বাধীন সার্বভৌম ভূখণ্ড অর্জন করেছিল। ১৭ই এপ্রিল বিশ্ববাসীকে জানান দিয়েছে, জনগণের অধিকারকে সামরিক নিপীড়ন, হত্যাযজ্ঞ চালিয়েও নিশ্চিহ্ন করা যায় না। জনগণের অভিপ্রায় একটি দণ্ডে এসে মিলিত হলে শত্রু পথ হারাবেই। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, নারীসহ সকলেই মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে মুক্তিবাহিনীতে পরিণত হয়েছিল। শত্রু হননে মত্ত হয়ে তারা দেশকে হানাদারমুক্ত করতে জীবনপণ বাজি রেখেছিল। বীর বাঙালি অস্ত্র হাতে বিজয়ের বেশে ঘরে ফিরেছে। স্বাধীনতার বাহান্ন বছর পরও তাই এই দিনটি মর্যাদাপূর্ণ। মুজিবনগর সরকারের জয়ন্তীকালে আমরা স্মরণ করতে পারি মেহেরপুরের আম্রকাননে বাঙালি জাতির উত্থানপর্ব কালকে। আলো হাতে এসেছিলেন বাঙালির প্রাণপ্রিয় মানুষেরা। বিজয় পতাকা হাতে ফিরেছিল কত যোদ্ধা। সবই আজ ইতিহাসের পাতায় পাতায় সন্নিবেশিত হয়ে আছে।

জাফর ওয়াজেদ: একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

শকাব্দ ও আরবি সন এবং বাংলা সনের সম্পর্ক

ড. মোহাম্মদ হাননান

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ২০১১ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় বিশ্ব বাঙালি সম্মেলনে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এতে তিনি হিজরি সন, বঙ্গাব্দ, শকাব্দ, খ্রিষ্টাব্দ ইত্যাদি বিষয়েও বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

> ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশকে সম্রাট আকবর নতুন একটি ক্যালেন্ডার স্থাপিত করার চেষ্টা করেছিলেন– এই প্রচেষ্টার মধ্যে আকবরের সর্ব-সংস্কৃতির সমন্বতা করার প্রচেষ্টা ছিল। যে বছরে তিনি সিংহাসনে উঠলেন সে বছরটি মুসলিম হিজরি সনে ৯৬৩ এবং হিন্দু শক্ বর্ষপঞ্জিতে ১৪৭৮, সেটি ইউরোপীয় মতে ১৫৫৬ সালে। 'তারিখ ইলাহি' নাম দিয়ে এই ক্যালেন্ডারটি শক্ সনের সূর্যমুখী বর্ষগণনা মানল, কিন্তু বছরের হিসাবটি শুরু হলো হিজরি থেকে নেওয়া ৯৬৩ দিয়ে। এই সমন্বিত ক্যালেন্ডারটি অবিভক্ত ভারতবর্ষের অন্য কোনো অঞ্চলে বেশিদিন চলল না। কিন্তু সেটি নতুনভাবে গ্রহণ করা হলো আমাদের সমন্বয়মুখী বাংলা সন রূপে। এর একটি আশ্চর্য ফল হচ্ছে যে, বাঙালি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই এই সমন্বয়টি আজকেও মানেন। যেমন একজন হিন্দু পূজারি যখন তাঁর কাজে এ বছরের... সনটিকে আহ্বান জানিয়ে শুরু করেন, তখন তাঁর বোধ হয় জানা থাকে না যে, এই পূজা উপলক্ষে তিনি স্মরণ করছেন মোহাম্মদের মদিনা যাত্রার পবিত্র দিনের কথা। [সূত্র : *মাসিক উত্তরাধিকার*, বাংলা একাডেমি, চৈত্র ১৪১৮ (মুদ্রণ মে ২০১২), পৃষ্ঠা ২২]।

অন্যত্র, অমর্ত্য সেন লিখেছেন,

> তুলনামূলকভাবে অধিক সাফল্য অর্জনকারী বাংলা সন হচ্ছে সমন্বয় সাধনের এ সাহসী প্রচেষ্টার ফল এবং যার উৎস খুঁজে পাওয়া যায় 'তারিখ-ইলাহি'র সংহতি প্রচেষ্টার মধ্যে (যা পরোক্ষভাবে আকবরের বহু সংস্কৃতিবাদী দর্শনের সঙ্গেও যুক্ত)। স্থানীয় ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করার সময় কোনও বাঙালি-হিন্দু এ-কথা না জানতে পারেন যে, হিন্দু পূজা অর্চনার সঙ্গে সম্পর্কিত দিনক্ষণগুলো হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মক্কা থেকে মদিনা যাত্রার স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। [অমর্ত্য সেন : *তর্কপ্রিয় ভারতীয়*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা ৩১৩]।

প্রকৃতপক্ষে বাংলা সন বা বাংলা সাল, যা-ই বলি না কেন, এর সঙ্গে শব্দগত ও ভাবগত ঐক্য রয়েছে ইসলামি ঐতিহ্যের। 'সন' আরবি শব্দ, অর্থ 'বছর', আবার 'বর্ষপঞ্জি'ও। 'সাল' অর্থও 'বছর', ফারসি শব্দ। আমরা যে দিন গণনায় 'তারিখ' শব্দটি ব্যবহার করি, তার শাব্দিক অর্থ 'দিন', আর এটিও আরবি শব্দ। 'বাংলা সন' বিষয়ক একজন গবেষক এ বিষয়কে সামনে রেখে মন্তব্য করেছেন, 'বাংলা সনের জন্ম-ইতিহাস থেকে প্রতিপন্ন হবে যে, আরবি হিজরি সনেরই বিবর্তনে বাংলা সনের জন্ম হয়েছে। প্রসঙ্গত বলে রাখা প্রয়োজন, বাংলা ও হিজরি সন মূলত একই সন এবং একই সময়ে (৬২২ খ্রি.), একই উৎস থেকে উৎসারিত। শুধু যে হিজরি সনের সঙ্গে বিশ্বনবীর হিজরতের স্মৃতিবিজড়িত তাই নয়, বাংলা সনের ইতিহাসের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। বস্তুত হিজরি সনের একটি শাখারূপেই বাংলা সনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে'। [মুহম্মদ আবু তালিব : *বাংলা সনের জন্মকথা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৭, লেখকের ভূমিকা-পত্র, পৃষ্ঠা এক]।

অমর্ত্য সেনের অভিমতের সঙ্গে গবেষক আবু তালিবের মন্তব্য ও সিদ্ধান্তের মিল রয়েছে। তবে বাংলা সন প্রবর্তনে সম্রাট আকবর (১৫৪২-১৬০৫) এবং উদ্ভাবনে পণ্ডিত আমির ফতেহ্ উল্লাহ্ সিরাজীর (মৃত্যু ১৫৮২)-র নামই বিখ্যাত হয়ে আছে। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে তাঁর নির্দেশে ৯৯২ হিজরিতে অথবা বলা যায় ১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা সন প্রবর্তিত হয়। প্রচলিত হিজরি সনের সঙ্গে মিল রেখে রাজ-জ্যোতিষী আমির ফতেহ্ উল্লাহ্ সিরাজী বাংলা সনের জন্ম দেন। তবে সম্রাট আকবর প্রথমেই বাংলা সন তৈরিতে যাননি। তিনি যে 'দ্বীন ইলাহি' নামে নতুন এক মতাদর্শ চালু করার চেষ্টা করেছিলেন, তার পাশাপাশি 'ইলাহি সন' নামে নতুন এক বর্ষপঞ্জিও চালু করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দুটোই লোকপ্রিয়তা পায়নি।

পরে তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রাজকর আদায়ে সুবিধার জন্য অনেকগুলো 'ফসলী সন' চালু করেন। ফসলী সনের মধ্যে বঙ্গদেশে 'বাংলা সন', উড়িষ্যায় 'আমলী সন', মহারাষ্ট্রে 'সুরসন' ইত্যাদি বিভিন্ন সন চালু করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, ফসলের মাধ্যমে রাজকর আদায়ে জনগণকে সহায়তা করা। আকবরের এ পন্থা সারা ভারতে লোকপ্রিয়তা পায়নি, কিন্তু তৎকালীন বঙ্গদেশে এর মাধ্যমে বাদশাহ আকবর প্রবর্তিত এ সন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এজন্য বঙ্গদেশে বাংলা সনকে এক সময় ফসলী সনও বলা হতো। স্বাধীন বাংলাদেশে, পশ্চিমবঙ্গে এবং ত্রিপুরায় এখনও ব্যাবসা কেন্দ্রে বাংলা সনের প্রথম দিনে 'হালখাতা' নামক পূর্বের 'ফসলী সন'-এর ধারণাকেই উজ্জীবিত করে রেখেছে। সম্রাট আকবর বাঙালি ছিলেন না, কিন্তু বঙ্গদেশের (বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা)-র জনগণের কাছে এ কারণেই অধিক জনপ্রিয় হয়ে আছেন। আকবরের পরে ভারতের অন্যান্য সম্রাটরাও ফসলী সনের এ ধারাকে অব্যাহত রাখেন। ফলে ধীরে ধীরে বাংলা সন মানুষের লোকসংস্কৃতির অংশ হয়ে দাঁড়ায়, যা আজও অব্যাহত আছে।

আমির ফতেহ্ উল্লাহ্ সিরাজী সম্রাটের নির্দেশে যখন বাংলা সনের ছকটি তৈরি করেন, তখন তিনি একে হিজরি সনের সমান্তরাল ও সমবয়সি করে তোলেন। অর্থাৎ হিজরি ও বাংলা সন দুটোই ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু হয়। এ বছরই রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। গবেষকরা বলছেন, 'যদিও মোহাম্মদ (সা.) রবিউল আউয়াল মাসের ৪ তারিখ থেকে হিজরত করেন, তথাপি হিজরি সন হিজরতের প্রকৃত তারিখ থেকে শুরু হয়নি। হিজরি সনের গণনা শুরু করা হয় মহররম মাসের প্রথম তারিখ থেকে। তবে বর্ষপঞ্জিটি তৈরি হয় হজরত উমর রা.-এর খেলাফতকালে, অর্থাৎ হিজরতের প্রকৃত ঘটনার ১৭ বছর পর হিজরি সন চালু হয়'। [মুহাম্মদ সগীর উদ্দীন মিঞা : *চান্দ্র-মাসের ইতিকথা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৩৬]।

এভাবে মোহাম্মদ (সা.)-এর মদিনা যাত্রার স্মারক হিসেবে হিজরি সন প্রবর্তিত হয়েছিল। যার প্রভাব বাংলা সনেও পড়ে। অপরদিকে সম্রাট আকবরের সিংহাসনে আরোহণের স্মারক

হিসেবে চালু হয়েছিল বাংলাসহ ভারতের অন্যান্য সন। বাংলা সন ঐতিহ্যগতভাবে এ দুটো বিশেষ ঘটনারই স্মারক হিসেবে চিহ্নিত। দুনিয়ার বর্ষপঞ্জির ইতিহাসে হয়ত বাংলা সনের মতো এমনটা গৌরব আর কোনো সনেরই নেই। সম্রাট আকবর চেয়েছিলেন, একটি ত্রুটিমুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত সৌর সন। [এ তথ্য *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন মুহম্মদ আবু তালিব, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭]। তাঁর প্রবর্তিত ইলাহি সন ভারতে কার্যকর হয়ে উঠতে পারেনি, যেটা হয়েছে বাংলাদেশে। বাংলা সন সম্রাট আকবরের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়ন করেছে। কারণ তা বাংলা অঞ্চলের সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। একটি স্বাধীন দেশের এবং একাধিক প্রদেশের সরকারি পঞ্জির স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে এ সন। সম্রাট আকবর এতদূর পর্যন্ত হয়ত কল্পনা করতে পারেননি। তবে বাংলা সনের উদ্ভাবক আমির ফতেহ্ উল্লাহ্ সিরাজী হয়ত এর সফলতা সম্পর্কে খানিকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। আকবরের রাজসভার প্রধান পণ্ডিত আবুল ফজল তাঁর *আকবরনামা* গ্রন্থে লিখেছেন, 'যদি এমন দুর্ঘটনা কোনোদিন ঘটে যে, দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি বিনষ্ট হয়, আর সিরাজী সাহেব জীবিত থাকেন, তাহলে তিনিই তার পুনর্গঠন করতে সক্ষম হবেন'। [আবুল ফজল : *আকবরনামা*, দ্বিতীয় খণ্ড, (ইংরেজি অনুবাদ : Tr. Mr Beverige), পৃষ্ঠা ২৩ [*বাংলা সনের জন্মকথা* গ্রন্থে উদ্ধৃত]।

এই জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ ফতেহ্ উল্লাহ্ সিরাজীর প্রতি সম্রাট আকবরের নির্দেশনা ছিল, 'যেহেতু ভারতে প্রচলিত সনগুলো সৌর পদ্ধতির এবং তার মাসগুলো চান্দ্র পদ্ধতির, তাই আমার নির্দেশ এই যে, প্রস্তাবিত সনটি যেন পূর্ণাঙ্গ সৌর পদ্ধতির হয়।' [*আকবরনামা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৩]। সিরাজীর কৃতিত্ব হলো, সন তৈরি করতে তিনি হিজরি সনের মর্যাদা ক্ষুণ্ন না করেই তার ওপর ভিত্তি করে নতুন সৌর সন তৈরি করেন। এতে ফারসি গুরগানি পদ্ধতি যেমন ব্যবহার করেন, তেমনি ভারতীয় শকাব্দের থেকেও দিন ও মাসের নামগুলো গ্রহণ করেন। পূর্বের ইলাহি সনে বছরের প্রথম দিনটিকে 'নওরোজ' উৎসবের দিন বলে গৃহীত হয়েছিল, এটি ছিল ফারসি বর্ষপঞ্জির প্রভাব। বাংলা সনেও এর প্রভাব চলছে, পহেলা বৈশাখ, নববর্ষ, উৎসবের দিন ইত্যাদি।

সিরাজী বাংলা সনের নামগুলো গ্রহণ করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় শকাব্দ থেকে। বঙ্গাব্দ ও শকাব্দের এখানেই সেতুবন্ধ। শকাব্দের বর্ষ শুরু হয় চৈত্র মাসে, বঙ্গাব্দের বর্ষ শুরু হয় বৈশাখ মাসে।

তবে বর্ষ গণনার প্রথম দিকে বাংলা সন শুরু হয়েছিল অগ্রহায়ণ মাস থেকে। অগ্রহায়ণ অর্থেও রয়েছে 'বর্ষ শুরু'। বছরের 'অগ্রে' যে যায়, সে হলো অগ্রহায়ণ। [*বাংলা সনের জন্মকথা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২১]। এটা ধান উৎপাদনের মাসও। সিরাজী যেহেতু ফসলী সন করেছিলেন বঙ্গাব্দকে সেদিক থেকে তিনি ঠিকই করেছিলেন অগ্রহায়ণ দিয়ে বর্ষ শুরু করে। বর্তমানে বাংলা সনে অগ্রহায়ণ অষ্টম মাস।

বাংলা মাসের নামগুলো একটি বাদে সবগুলোই এসেছে নক্ষত্রের নাম থেকে। নীচের সারণিটি দেখা যেতে পারে : বৈশাখ < বিশাখা, জ্যৈষ্ঠ < জ্যেষ্ঠা, আষাঢ় < আষাঢ়া, শ্রাবণ < শ্রবণা, ভাদ্র < ভাদ্রপাদ, আশ্বিন < অশ্বিনী, কার্তিক < কৃত্তিকা, অগ্রহায়ণ < (বছরের আগে), পৌষ < পুষ্য, মাঘ < মঘা, ফাল্গুন < ফল্গুনী, চৈত্র < চিত্রা।

কথাসাহিত্যিক ও বিজ্ঞান লেখক সত্যেন সেন বলেছেন, 'বৈশাখ থেকে চৈত্র, এই বারোটি মাস প্রকৃতপক্ষে চান্দ্রমাস। এই নামের চান্দ্রমাসগুলো সৌর মাস রূপে গৃহীত ও স্বীকৃত হয়ে গেল। কিন্তু লক্ষ করতে হবে, এটা একেবারে গায়ের জোরে বা খামখেয়ালিভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। এরও একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল'। ['বিশ্ব পটভূমিতে বাংলা মাস-তালিকা', *সত্যেন সেন রচনাবলি*, ৫ম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-২০১৫]।

তবে এখানে শুধু অগ্রহায়ণ মাসটিই নক্ষত্রের নামে নেই। 'হায়ণ' অর্থ 'বছর', অগ্রহায়ণ মানে বছরের আগে বা বছরের শুরু। পরে ফসলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বৈশাখ মাসকে প্রথম মাস করা হয়। পূর্বে বৈশাখ মাসে 'চৈতালি ফসল' তোলা হতো বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন। [মুহম্মদ আবু তালিব, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬]। অবশ্য আবহাওয়ার নানারকম বিবর্তনে ঋতু বৈচিত্র্যেও পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক কিছুতেই বিষয় ও ফলাফলের মিল পাওয়া যাবে না। যেমন, আমাদের অভিধানে 'মধুমাস' নামে একটি শব্দ

আছে, কিন্তু এর অর্থ দেওয়া আছে 'চৈত্র' মাস। [*বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, সম্পাদক আহমদ শরীফ, ঢাকা ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৪৪৬-৪৪৭]। হয়ত এক সময়ে চৈত্র মাসেই রসালো ফলগুলো হতো, তাই চৈত্র মাসকে মধুমাস বলা হতো, কিন্তু এখন রসালো ফল বাজারে আসে প্রধানভাবে জ্যৈষ্ঠ মাসে। ফসলী সনের হিসাবটাতে এমনি ঘটনা থাকতে পারে। অগ্রহায়ণ মাস প্রথম স্থান থেকে অষ্টম স্থানে চলে যায়, সে স্থান দখল করে নেয় বৈশাখ মাস। বাংলা সনের প্রাথমিক যুগে এমন কিছু ভাঙাগড়া হয়েছে। দুনিয়ার বিভিন্ন সনের ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা আছে। খ্রিষ্টীয় সনও আগে শুরু হতো মার্চ মাস দিয়ে, পরে জানুয়ারি প্রথম মাস হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

বাংলা সন প্রথম থেকেই রাশি ও তিথি মেনে চলে। বারোটি রাশি : মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। বাংলা সন তিথিও মেনে চলে। এগুলোর মধ্যে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা গুরুত্বপূর্ণ। ২৪ ঘণ্টায় একদিন এবং সাত দিনে (সপ্ত অহের সমাহারে) সপ্তাহ নির্ধারিত রয়েছে এ সনে। তবে ৪ সপ্তাহে এক মাস কখনো বলা হয় না, বলা হয় ৩০ দিনে এক মাস, ১২ মাসে এক বছর। এখানে বৈচিত্র্য হলো, মাস গণনা হয় চান্দ্র পদ্ধতিতে, কিন্তু সন হলো সৌর। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং নৃগোষ্ঠীর ধর্মাবলম্বীরা ধর্মীয় আচার ও বিয়ের পার্বণ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতে এভাবেই হিসাব করে চলে।

বাদশাহ আকবরের সভাসদ আমির ফতেহ্ উল্লাহ্ সিরাজী ছিলেন এই বাংলা সনের জনক। তাঁর সৃজনশীল চিন্তা ও মননশীলতায় দুনিয়ার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, যা আজও টিকে আছে। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমির তত্ত্বাবধানে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে একদল পণ্ডিত সিরাজীর সনের সামান্য সংশোধন করেন। এতে অধিবর্ষ (লিপইয়ার) পদ্ধতি যুক্ত হয়ে বাংলা সন অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞানভিত্তিক রূপ লাভ করেছে। বাংলা একাডেমি দীর্ঘদিনের চেষ্টায় ২০১৫ সালে বাংলা বর্ষপঞ্জির আরও সংস্কার করেছে। নতুন বাংলা বর্ষপঞ্জি অনুসারে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন– এই ছয় মাস হবে ৩১ দিন। এতদিন বৈশাখ থেকে ভাদ্র পর্যন্ত পাঁচমাস ৩১ দিন গণনা হতো। কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও চৈত্র– এই পাঁচ মাস হবে ৩০ দিন। আগে আশ্বিন থেকে চৈত্র–এই সাত মাস ৩০ দিন ছিল। এখন ফাল্গুন মাস হবে ২৮ দিন এবং গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জিতে যে বছর অধিবর্ষ হবে (লিপইয়ার) সে বছর বাংলায় ফাল্গুন মাস ২৯ দিন গণনা করা হবে। আগামী ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ হবে অধিবর্ষ বা লিপইয়ার। তাই আগামী বছর বাংলা বর্ষপঞ্জিতে ফাল্গুন মাসও হবে ২৯ দিন।

ভাষা আন্দোলনের ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছিল ৮ই ফাল্গুন। কিন্তু অনেক সময় ২১শে ফেব্রুয়ারি পড়ত ৯ই ফাল্গুন। বিজয় দিবস ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ছিল পয়লা পৌষ, বাংলা পঞ্জিকায় দিনটি অনেক সময় পড়ত ২রা পৌষ। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন ২৫শে বৈশাখ, কবি নজরুলের জন্মদিন ১১ই জ্যৈষ্ঠ, গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জির সঙ্গে আমাদের প্রচলিত বঙ্গাব্দ অনেক সময়ই মিলত না। এই অসামঞ্জস্য দূর করে দুই বর্ষপঞ্জির মধ্যে দিন গণনার এখন সমন্বয় করা হয়েছে। ফলে এখন থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি ৮ই ফাল্গুন, স্বাধীনতা দিবস ২৬শে মার্চ ১২ই চৈত্র, বিজয় দিবস ১৬ই ডিসেম্বর পয়লা পৌষ, রবীন্দ্রজয়ন্তী ৮ই মে ২৫শে বৈশাখ, নজরুলজয়ন্তী ২৫শে মে ১১ই জ্যৈষ্ঠ–এমন করে সব বিশেষ দিবসগুলো বাংলা ও গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জির দিন গণনায় অভিন্ন করা হয়েছে।

বাংলা দিনপঞ্জিকার বিজ্ঞানভিত্তিক সংস্কারের উদ্যোগ শুরু হয়েছিল ১৯৫০-এর দশকে। ভারত সরকার বিজ্ঞানী মেঘনাথ সাহাকে প্রধান করে পঞ্জিকা সংস্কার কমিটি করেছিল। কিন্তু ভারতে এ সংস্কার সফলতা লাভ করতে পারেনি। ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গে পঞ্জিকাওয়ালাদের দাপট বেশি। কিন্তু বাংলাদেশে ১৯৬৮ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর উদ্যোগ আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ২০১৫ সালে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালককে আহ্বায়ক করে পঞ্জিকা সংস্কার কমিটি করা হয়েছিল। এই কমিটি বাংলা ও গ্রেগরিয়ান দিনপঞ্জির সমন্বয় করে। সুপারিশ করা বাংলা সনের তারিখ সরকারি দিনপঞ্জিকায়ও সমন্বয় করা হয়েছে।

কয়েক দিনের মধ্যেই পুরনো ১৪২৯ বঙ্গাব্দের বিদায়ের পর নতুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দের যাত্রা শুরু হয়। বছরের প্রথম দিনটিতে উৎসবে মেতে উঠবে সমগ্র জাতি। এই পয়লা বৈশাখকে উৎসবে পরিণত করেন রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁরা ছিলেন পিরালি ব্রাহ্মণ, জাত-ব্রাহ্মণরা তাঁদের স্বীকৃতি দেয়নি। ফলে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম হয়ে যান। বাংলা একাডেমির আধিকারক ও গবেষক ফরহাদ খান জানিয়েছেন, 'ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যদের একত্রে রাখার জন্য তিনি শুরু করেন পয়লা বৈশাখের উৎসব ও মাঘোৎসব। [ফরহাদ খান : 'মারি ও উৎসব', *প্রথম আলো*, ১৭ই এপ্রিল ২০২০]। একইসঙ্গে মনে রাখতে হবে, বাংলা সনটি হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর স্মৃতি বিজড়িত একটি ঘটনার সঙ্গে জড়িত। হিজরি সনের মতোই বাংলা সনটিকে তাই পবিত্র মনে করতে হবে।

ড. মোহাম্মদ হাননান: লেখক ও গবেষক, drhannapp@yahoo.com

স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান

সরকার জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ১টি প্রতিষ্ঠানকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৩' প্রদান করেছে। ২৩শে মার্চ দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য এবার চারজন স্বাধীনতা পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁরা হলেন– বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল (অব.) সামসুল আলম, মরহুম লে. এ জি মোহাম্মদ খুরশীদ, শহিদ খাজা নিজামউদ্দিন ভূইয়া এবং আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী (মায়া) বীর বিক্রম।

এছাড়া সাহিত্যে মরহুম ড. মুহাম্মদ মঈনুদ্দিন আহমেদ (সেলিম আল দীন), সংস্কৃতিতে পবিত্র মোহন দে, ক্রীড়ায় এ এস এম রকিবুল হাসান, গবেষণা ও প্রশিক্ষণে বেগম নাদিরা জাহান (সুরমা জাহিদ) ও ড. ফেরদৌসী কাদরী পুরস্কার পেয়েছেন। আর পুরস্কারের জন্য মনোনীত প্রতিষ্ঠানটি হলো ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।

উল্লেখ্য, সরকার ১৯৭৭ সাল থেকে প্রতিবছর স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এ পুরস্কার প্রদান করে আসছে। স্বাধীনতা পুরস্কারের ক্ষেত্রে পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ৫ লাখ টাকা, ১৮ ক্যারেট মানের ৫০ গ্রামের স্বর্ণপদক, পদকের একটি রেপ্লিকা ও একটি সম্মাননাপত্র দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন: সিনথিয়া আক্তার

ঈদুল ফিতরের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব

ড. আবদুল আলীম তালুকদার

পৃথিবীজুড়ে বসবাসকারী প্রতিটি জাতিরই নিজস্ব উৎসব-অনুষ্ঠানাদি রয়েছে। সে মতে প্রাচীনকাল থেকেই এ বিশ্বচরাচরের প্রায় প্রতিটি জাতি-গোষ্ঠী-সম্প্রদায় তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় উৎসব পালন করে আসছে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে। এসব উৎসব-অনুষ্ঠানে কোনো প্রকার উঁচুনীচুর বৈষম্য, ধনী-গরিবের শ্রেণিবিভেদ, কালো-ধলার দ্বন্দ্ব সচরাচর তেমন লক্ষ করা যায় না তবে ক্ষেত্র বিশেষে এর ব্যত্যয় যে ঘটে না, তা হলফ করে বলা যাবে না। কিন্তু মুসলিম জাতির ধর্মীয় আনন্দোৎসব পৃথিবীর অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর ধর্মীয় উৎসবগুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলাম প্রবর্তিত আনন্দোৎসব ইহকালীন ও পরকালীন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত। তাই মুসলমানদের পবিত্র ঈদ নিছক উৎসব নয় বরং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও বটে।

ঈদ হচ্ছে বিশ্ব মুসলিমের একটি বার্ষিক মহাসম্মিলন ও আনন্দ উৎসবের দিন। এই বিশেষ দিন মুসলমানদের জীবনে বছরে দুবার ফিরে আসে। চান্দ্র বর্ষের গণনায় পালিত এই দুটি প্রধান উৎসবকে ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় বলা হয় ঈদ; এর একটি 'ঈদুল ফিতর' বা রোজার ঈদ এবং অন্যটি 'ঈদুল আজহা' বা কুরবানির ঈদ।

পবিত্র রমজান মাসজুড়ে সিয়াম সাধনা তথা রোজা পালনের পর শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে মুসলিম জাহানে যে আনন্দোৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে তা 'ঈদুল ফিতর' নামে অভিহিত। 'ঈদুল ফিতর' আরবি ভাষার শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। 'ঈদ' শব্দের অনেকগুলো অর্থ রয়েছে তার মধ্যে একটি অর্থ হলো ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা। অর্থাৎ ঈদ এমন উৎসব, যা ফিরে ফিরে আসে, পুনরায় অনুষ্ঠিত হয় প্রভৃতি। এ দিবসটি মুসলমানদের জীবনে বার বার ফিরে আসে এবং সবাই একত্র হয়ে উদ্‌যাপন করে বলেই এ দিনকে ঈদ বলা হয়। ঈদ শব্দ দ্বারা এ দিবসের নামকরণ করার তাৎপর্য হলো মহান আল্লাহ এ দিবসে তাঁর বান্দাদের অঢেল নিয়ামত ও অনুগ্রহ দ্বারা বার বার ধন্য করেন ও তাঁর দয়ার ছায়াতলে আশ্রয় দান করেন। ঈদের অন্য একটি অর্থ খুশি, আনন্দ, উচ্ছল-উচ্ছ্বাসে হারিয়ে যাওয়ার মুহূর্ত। ঈদ প্রতিবছর চান্দ্র বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী নির্দিষ্ট মাসের নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট রীতিতে এক অনন্য আনন্দ-ঐশ্বর্য বিলাতে ফিরে আসে। এক মাস কঠোর সিয়াম সাধনার মাধ্যমে নানা নিয়মকানুন পালনের পর উদ্‌যাপিত হয় ঈদুল ফিতর। আর 'ফিতর' শব্দের অর্থ স্বভাব, বিদীর্ণ করা, ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করা, রোজাব্রত ভঙ্গকরণ ইত্যাদি। আরেক অর্থ বিজয়। দীর্ঘ এক মাস রোজা রাখার পর যে উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়, তাই ঈদুল ফিতরের উৎসব। বিজয় শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পুরো রমজান মাস রোজা রেখে খোদাভীরু মানুষ তাঁর ভেতরের সব রকমের বদভ্যাস ও রিপুগুলোকে দমন করার মাধ্যমে এক রকমের বিজয় অর্জন করেন। সেই অর্থে এটি বিজয় হিসেবেও দেখা যায়। সব মিলিয়ে ঈদুল ফিতরকে বিজয় উৎসব বলা যেতে পারে। দীর্ঘ একটি মাস মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে রোজা ও সংযম সাধনার পর বিশ্ব জাহানের মুসলমানগণ এই দিনে রোজাব্রত হতে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে এবং এ উপলক্ষে আনন্দোৎসব করে থাকে; এজন্য এই উৎসবের নামকরণ করা হয়েছে 'ঈদুল ফিতর' বা স্বাভাবিকতায় প্রত্যাবর্তনের উৎসব।

মুসলিম সম্প্রদায় রমজান মাসের নতুন চাঁদ দেখে রোজা পালন শুরু করে এবং শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখে রোজা রাখা ছেড়ে দেয়; সে কারণেও এটিকে ঈদুল ফিতর বলা হয়। ঈদুল ফিতর রোজাদার মুমিন মুসলমানের জন্য পরম আনন্দের দিন এবং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিঃসন্দেহে বিশেষ একটি পুরস্কার। মহানবি (সা.) ইরশাদ করেন, 'প্রতিটি জাতিরই আনন্দ-উৎসব রয়েছে, আমাদের আনন্দ-উৎসব হচ্ছে এই ঈদ।' (*বুখারি ও মুসলিম*)

উম্মাতে মুহাম্মদিকে আল্লাহ তায়ালা বিশেষ কিছু বরকতময় নিয়ামতপূর্ণ অনুষ্ঠান প্রদান করেছেন, যা অন্য কোনো নবি-রাসুলের অনুসারীরা লাভ করেনি। তন্মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা, প্রীতি ও সৌহার্দ্যের এক অনুপম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ও মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার অনুকম্পা লাভের অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান পবিত্র ঈদ। নবি করিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, ঈদের আনন্দ শুধু তাদের জন্য যারা রমজানের রোজা, তারাবির নামাজসহ আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় বিধিবিধান গুরুত্ব সহকারে আদায় করেছে। আর যারা রমজানের রোজা ও তারাবি আদায়

করেনি তাদের জন্য ঈদের আনন্দ নেই, বরং তাদের জন্য ঈদ তথা ঈদানন্দ অগ্নিশিখা সমতুল্য। (*সহিহ বুখারি*)

ভারতীয় উপমহাদেশের বিশিষ্ট ওলি কামিল খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) বলেছেন, 'ঈদুল ফিতরের উদ্দেশ্য হলো, রমজান মাসের রোজার মাধ্যমে রোজাদারের মনের কুপ্রবৃত্তিগুলোকে ভেঙে চুরমার করে মহান আল্লাহর আসন হিসেবে গড়ে তোলার আনন্দ উপভোগ ও উদ্‌যাপন করা।'

হজরত রাসুলে করিম (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পর সেখানে দেখতে পান যে, প্রতিবছর মদিনায় পারসিকদের প্রভাবে শরতের পূর্ণিমায় 'নওরোজ উৎসব' এবং বসন্তের পূর্ণিমায় 'মিহিরজান উৎসব' উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। এ উৎসব দুটোতে মদিনাবাসীরা তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য লালন করে নানারকম উদ্ভট খেলাধুলা ও অনুষ্ঠানপর্ব উদ্‌যাপন করছে। এ দুটি ভিন্ন আঙ্গিকের উৎসবের রীতিনীতি ছিল ইসলামি রীতিনীতির একেবারে বিপরীত। তাই নবি করিম (সা.) মুসলমানদেরকে এতে যোগদান হতে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করেন। তদস্থলে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা– এই দুটি উৎসব পালনের রীতি প্রবর্তন করেন।

এ মর্মে বিশিষ্ট সাহাবি হজরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, মদিনায় নবি (সা.) হিজরত করে আসার পর দেখলেন, মদিনাবাসী দুদিন খুব আনন্দ উৎসব করছে। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, এ দুদিনে তোমরা কী করো? তারা জবাবে বললেন, আমরা জাহিলিয়াতের যুগে এ দুটো দিনে খেলাধুলা, আনন্দ-ফুর্তি করতাম। নবি (সা.) বললেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এ দুটো দিনের পরিবর্তে অন্য দুটো দিন প্রদান করেছেন। তার একটি হলো ঈদুল ফিতরের দিন আর অপরটি হলো ঈদুল আজহার দিন। (*সুনানে আবু দাউদ:* ১১৩৬)

ঈদের অন্যতম ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব হলো, এ দিন বিশ্ব মুসলিম পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঈদগাহে গিয়ে ছোটো-বড়ো, ধনী-নির্ধন, আমির-ফকির মিলিতভাবে একই কাতারে দাঁড়িয়ে এই বিশেষ দুই রাকাত ওয়াজিব নামাজ আদায় করে থাকে। নামাজ শেষে একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি করে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়। ঈদের দিন সাধ্যমতো সবাই নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ পরে পুরোনো জরাজীর্ণতাকে বিদায় দিয়ে নতুন উদ্যমে আনন্দে মেতে ওঠে। আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব একে অপরের বাড়িতে দাওয়াত খেয়ে সামাজিক ও বন্ধুত্বের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে।

ইসলামি শরিয়া অনুযায়ী, ঈদের নামাজ আদায়ের উৎকৃষ্ট সময় সূর্যোদয়ের পর থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত। ঈদের নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। যারা বিনা ওজরে ঈদের নামাজ আদায় করে না তারা অবশ্যই গুণাহগার হবে। কেউ বিশেষ কোনো কারণে এ নামাজ আদায় করতে না পারলে এর কোনো কাজা আদায় করার প্রয়োজন পড়ে না। কারণ ইসলামি শরিয়ায় ঈদের নামাজের কাজা আদায় করার কোনো বিধান নেই।

ঈদের দিন মুসলিম মিল্লাতের জন্য এক পরম আনন্দ উৎসব ও সামগ্রিক উৎকর্ষ সাধনের দিন। নবি করিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, রোজাদারের জন্য দুটি আনন্দ হলো– ১. রোজা ভঙ্গের সময় অর্থাৎ ইফতারের সময় ২. শেষ বিচারের দিনে তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়। পূর্ণ এক মাস সিয়াম সাধনা আর কঠোর আত্মসংযম শেষে রোজাদারের অবস্থা পুরোপুরি উদ্ভাসিত হয় আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী তথা সকলের সাথে পবিত্র ঈদের আনন্দ ভাগাভাগির মধ্য দিয়ে।

ঈদের নামাজ ওয়াজিব। বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, ঈদের নামাজ পড়ার বিধান নাজিল হওয়ার পর থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.) মৃত্যু পর্যন্ত কোনো বছরই কোনো ঈদের নামাজ পড়া বাদ দেননি। তেমনি খুলাফায়ে রাশেদিনের কেউ তা বাদ দেননি। এর দ্বারা ঈদের নামাজ ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়। রমজান মাস শেষে শাওয়াল মাসের এক তারিখে ঈদুল ফিতরের নামাজ পড়া ওয়াজিব। তবে যুক্তিসংগত ওজর থাকলে পরের দিন পড়া যাবে। অবশ্য ঈদুল আজহার নামাজ ওজর থাকলে পরবর্তী দুদিন পর্যন্ত পড়া জায়েজ। সূর্য আনুমানিক তিন গজ পরিমাণ উপরে উঠার পর অর্থাৎ সূর্যোদয়ের আনুমানিক ২৪-২৫ মিনিট পর থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত ঈদের নামাজের ওয়াক্ত। ঈদুল আজহার নামাজ অপেক্ষাকৃত আগে এবং ঈদুল ফিতরের নামাজ কিছুটা বিলম্বে আদায় করা উত্তম। যেহেতু ঈদুল আজহার নামাজের শেষে কুরবানি করতে হয় সেজন্য ঈদুল আজহার নামাজ যথাশীঘ্রই আদায় করা উত্তম।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি (সা.) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন ঈদগাহে যেতেন এবং সকলকে সঙ্গে নিয়ে ঈদের নামাজ পড়তেন। অথচ মসজিদে নববীতে এক রাকাত নামাজে এক হাজার, কোনো কোনো বর্ণনায় দশ হাজার ও পঞ্চাশ হাজার রাকাত নামাজের সওয়াব লাভের সুসংবাদ রয়েছে। এতৎসত্ত্বেও নবি (সা.) মসজিদে নববীতে ঈদের নামাজ না পড়ে সকলকে নিয়ে ঈদগাহে চলে যেতেন এবং সেখানে নামাজ আদায় করতেন। তাই ইসলামি ধর্মতত্ত্ববিদদের মতে, ঈদগাহে নামাজ পড়া উত্তম। তবে বিনা ওজরে মসজিদে ঈদের নামাজ না পড়াই ভালো। বৃষ্টির কারণে মসজিদে ঈদের নামাজ পড়া জায়েজ আছে। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার ঈদের দিনে বৃষ্টি হলো, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁদেরকে নিয়ে মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করলেন। (*সুনানে আবু দাউদ:* ১১৬২)

ঈদের নামাজ হলো সামাজিক নামাজ। বছরে দুদিন সমাজের সর্বস্তরের মুসলিম জনতা ঈদের জামায়াতে সানন্দে উপস্থিত হয়। একে অন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কুশল বিনিময়ের একটা অপূর্ব সুযোগ আসে এই দিনে। ঈদুল ফিতরের সময় সমাজের গরিব-দুঃখীকে সাদকা-ফিতরা প্রদান এবং একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাতে যে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়, তা এই ধরাতলকে স্বর্গোদ্যানে পরিণত করে।

মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে রোজাদারদের জন্য বিশেষ একটি পুরস্কার হচ্ছে ঈদুল ফিতর। নবি করিম (সা.) ইরশাদ করেন, ঈদুল ফিতরের দিন যখন আসে তখন আল্লাহ তায়ালা রোজাদারদের পক্ষে গর্ব করে ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলেন, হে পুণ্যাত্মা ফেরেশতাগণ তোমরাই বলো রোজাদারদের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় তাদের দায়িত্ব পুরোপুরিভাবে পালন করে ঈদের ময়দানে সমবেত হয়েছে তাদের রোজার বিনিময়ে আজকের এই দিনে কী প্রতিদান দেওয়া যেতে পারে? তখন ফেরেশতারা জবাবে আল্লাহ তায়ালাকে বললেন, হে মহান প্রভু, আপনি তাদের পুণ্যময় কাজের জন্য উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। কারণ তারা দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনা করেছে এবং রাত্রিকালে ইবাদত করার নির্দেশ ছিল তারা তা পালন করেছে তাই তাদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক তাদের প্রদান করুন। তখন আল্লাহ তায়ালা রোজাদারদের ডেকে বলতে থাকেন, 'হে আমার বান্দা তোমরা যারা যথাযথভাবে রোজা পালন করেছ, রাত্রিকালে নামাজ আদায় করেছ, তোমরা তাড়াতাড়ি

ঈদের নামাজ আদায় করার জন্য ঈদগাহে যাও এবং তোমরা তোমাদের প্রতিদান গ্রহণ করো'। ঈদের নামাজের শেষে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের উদ্দেশে বলতে থাকেন, 'হে আমার প্রিয় বান্দারা আমি আজকের এ দিনে তোমাদের সকল পাপগুলোকে পুণ্যের দ্বারা পরিবর্তন করে দিলাম। অতএব তোমরা নিষ্পাপ ও পুণ্যময় দেহ-মন নিয়ে নিজ নিজ গৃহে ফিরে যাও। এ দিনটি পুরস্কারের দিন, আকাশে এই দিবসের নাম 'উপহার দিবস' নামে নামকরণ করা হয়েছে'। (*বায়হাকী ও মিশকাত শরীফ*)

নবি করিম (সা.) আরও ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি পুণ্যময় ৫টি রাতে ইবাদত-বন্দেগি করে সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ রয়েছে, আর সেই সুসংবাদটি হচ্ছে 'জান্নাত এবং পুণ্যময় ৫টি রাত হলো– ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, শবে বরাত, জ্বিলহজ্জের রাত ও আরাফাতের রাত'। (*বায়হাকী*)

মহানবি (সা.) আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি দুঈদের রাতে পুণ্যের প্রত্যাশায় ইবাদত-বন্দেগি করে সেদিন (কিয়ামতের দিন) তার অন্তর এতটুকু ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না যেদিন অন্যদের অন্তর ভীত-বিহ্বল অবস্থায় মৃতবৎ হয়ে পড়বে। (*আত-তারগীব*)

ঈদুল ফিতরের দিন গরিব-মিসকিন ও অভাবী লোকদের মাঝে শরিয়তের নির্ধারিত যে অর্থ বা খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা হয় তাকে সদকাতুল ফিতর বলে। সদকাতুল ফিতর আদায় করা প্রত্যেক সামর্থ্যবান নারী-পুরুষের ওপর ওয়াজিব। সদকাতুল ফিতরকে রোজার কাফ্ফারা বলা হয়। পক্ষান্তরে ঈদের দিনে অভাবী ব্যক্তিরাও যাতে অনাহারে থাকার কারণে ঈদের খুশি থেকে একেবারে বঞ্চিত না হয় তার জন্যই মূলত এই সদকাতুল ফিতর ব্যবস্থার প্রবর্তন।

ঈদুল ফিতরের অন্যতম ইহলৌকিক তাৎপর্য হলো, রমজানের রোজা শেষে সাদকাতুল ফিতর এবং ঈদুল আজহার কুরবানির চামড়া দিয়ে অনাথ-অসহায়-গরিবদের আর্থিক সহায়তার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। অসচ্ছল পরিবারের সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে বা কর্মহীনদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে দুটো ঈদই যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে। আর ঈদের পারলৌকিক তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তায়ালা রমজান মাসকে বিভিন্ন নিয়ামতে ভরপুর করেছেন। এ মাসেই পবিত্র *কুরআনুল কারিম* নাজিল করা হয়েছে। দিনের বেলা সিয়াম সাধনা পালন আর রাত্রিকালে ইবাদতের মধ্যে অনেক ফজিলতের কথা বিধৃত হয়েছে। লাইলাতুল কদর নামক হাজার রাতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ একটি মহিমান্বিত রাত দান করা হয়েছে এ মাসে। পাপ মোচনের এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক সুবর্ণ সুযোগ এসে যায় রমজান মাসে। এ সমস্ত নিয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ আনন্দ উৎসবের ব্যবস্থা। তাই ঈদ নিছক আনন্দ উৎসব নয়, এটি একটি ফজিলতপূর্ণ ইবাদত। এজন্যই ঈদের রাতে এবং ঈদের দিনের অনেক ফজিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে হাদিসে। সঠিক নিয়মে সিয়াম পালনকারীদের সম্পর্কে রাসুল (সা.)-এর বাণী হলো: 'যারা যথাযথভাবে সিয়াম সাধনা করে তারা ঈদের নামাজ শেষে নবজাতক শিশুর ন্যায় পাপমুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে। আর আল্লাহ তায়ালা তাদের জীবনের সমস্ত গুণাহ ক্ষমা করে দেন'।

হজরত আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাতে আল্লাহর নিকট সওয়াব প্রাপ্তির নিয়তে ইবাদত করবে তার হৃদয় সেদিনও জীবিত থাকবে যেদিন সকল হৃদয়ের মৃত্যু ঘটবে'। (*সুনানে ইবনে মাজাহ্*: ১৭৮২) হজরত নবি করিম (সা.) যে পাঁচটি রাতের দোয়া কবুল হওয়ার কথা বলেছেন তার মধ্যে ঈদুল ফিতরের রাতটি অন্যতম।

হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে যে, দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রা.) ঈদুল ফিতরের দিন খুব কান্নাকাটি করতেন এবং খাবারও খুব কম গ্রহণ করতেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলতেন, আল্লাহ তায়ালা যাদের রোজা কবুল করেছেন এবং যাদেরকে ক্ষমা করেছেন তারাই আনন্দ উৎসব করতে পারেন। কিন্তু আমি তো জানি না, আমার রোজা কবুল করা হয়েছে কি না? কাজেই আমি কীভাবে আনন্দ-উৎসব করতে পারি?

ঈদুল ফিতরের দিন কতিপয় কাজ করা উত্তম। আর তাহলো: (১) যতদূর সম্ভব অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করা। (২) মিসওয়াক করা এবং সকাল সকাল গোসল করা। (৩) নিজের সাধ্যানুযায়ী উৎকৃষ্ট তথা পবিত্র, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করা। (৪) সুগন্ধিদ্রব্য ও চোখে সুরমা ব্যবহার করা। (৫) যথাশীঘ্র প্রত্যুষে ঈদগাহে গমনে অযথা বিলম্ব না করা। (৬) সামর্থ্য অনুযায়ী উত্তম খাবারের বন্দোবস্ত করা এবং প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, এতিম, ফকির-মিসকিন, গরিব-দুঃখীকে পানাহার করানো। (৭) ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে মিষ্টিমুখ করা, আর ঈদুল আজহার নামাজের পূর্বে কোনো প্রকার আহার গ্রহণ না করে নামাজের পর যথাশীঘ্র সম্ভব পশু কুরবানি করে সেই গোশত দ্বারা আহার করা। (৮) ঈদগাহে গমনের পূর্বেই সাদকায়ে ফিতর আদায় করা। (৯) ঈদগাহে এক পথে যাওয়া আর ফেরার সময় অন্য পথে আসা এবং যথাসম্ভব পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া। (১০) ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পথে চুপে চুপে তাকবির (আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়াল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ) পাঠ করা আর ঈদুল আজহা তথা কুরবানির ঈদের দিন উচ্চস্বরে উক্ত তাকবির পাঠ করা। (১১) ঈদে শুভেচ্ছা বিনিময় করা। (১২) ঈদের খুতবা শ্রবণ করা। (১৩) দোয়া ও ইস্তিগফার করা। (১৪) মুসাফাহা ও মুয়ানাকা করা। (১৫) ফিতরা আদায় করা। (১৬) এতিম, অনাথ-অসহায়দের খোঁজখবর নেওয়া। (১৭) প্রতিবেশীর খোঁজখবর নেওয়া ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায় যে, ঈদ আসে বিশ্ব মুসলিমের দ্বারপ্রান্তে বাৎসরিক আনন্দের বার্তা নিয়ে, আসে সীমাহীন প্রেম-প্রীতি, সৌহার্দ্য-ভালোবাসা ও কল্যাণের সওগাত নিয়ে, সেই ঈদকে যথার্থ মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা এবং ঈদের নামাজ যথাযথভাবে আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। বছরে দুদিন বিশ্ব মুসলিমের জন্য যে মহাসম্মেলনের ব্যবস্থা মহান আল্লাহ তায়ালা করে দিয়েছেন, যার অনুপ্রেরণায় সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ পারে কোরান নির্দেশিত সমাজ নির্মাণ করতে, পারে ন্যায়-নীতি ও ইনসাফভিত্তিক সুশাসন প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নিতে, সমাজের কলুষতা বিদূরিত করতে, পারে দল-মতনির্বিশেষে হিংসা-বিদ্বেষ-কলহ ভুলে পরস্পর প্রেম-প্রীতির ডোরে আবদ্ধ হয়ে ঈদের আনন্দের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণ করতে; যার মাধ্যমে এই কণ্টকাকীর্ণ ও সংঘাতময় পৃথিবীতে স্বর্গীয় আবেশ সৃষ্টি হতে পারে।

ড. আবদুল আলীম তালুকদার: কবি, প্রাবন্ধিক ও সহকারী অধ্যাপক, শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, শেরপুর, dr.alim1978@gmail.com

নজরুলের ঈদের নাটক

অনুপম হায়াৎ

কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিভার দানে সমৃদ্ধ হয়েছে সাহিত্য, সাংবাদিকতা, রাজনীতি, মঞ্চ, বেতার, চলচ্চিত্র, গ্রামোফোন রেকর্ড, সংগীত ও সুর। তাঁর রচিত 'বিদ্রোহী' (১৯২১) কবিতা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দুটি কবিতার একটি। ইসলামি সাহিত্য, সংগীত এবং নাটক রচনায়ও রয়েছে তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর। তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় রচনা করেছেন ঈদুল ফিতর নিয়ে সেই অমর গান 'ও মন রমজানেরই রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ ...'।

ঈদুল ফিতর নিয়ে নজরুল রচিত দুটি নাটকেরও সন্ধান পাওয়া যায়। এই দুটি নাটক হচ্ছে 'ঈদুল ফেতর' ও 'ঈদ'। দুটিই শ্রুতি-নাটক আকারে রচিত হয়েছিল। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এই দুটি নাটক সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

ঈদুল ফেতর (১৯৩৬)

'ঈদুল ফেতর' রেকর্ড-নাট্য ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় (রেকর্ড নং এন ৯৮২৩-৯৮২৪)। নাটিকার কুশীলব হচ্ছে ফকির, জমিদার, ইমতাজ, বদনার মা ও পথচারী। এতে তিনটি গান রয়েছে।

১. ফুরিয়ে এল রমজানেরই মোবারক মাস (ফকির)
২. ঈদের খুশীর তুফানে আজ (সমবেত)
৩. প্রাণের প্রিয়তম (ফকির)

রেকর্ড-নাট্যে অংশ নেন ধীরেন দাস (ফকির), আশ্চর্যময়ী (বদনার মা)। নজরুল এই নাটিকায় একজন তথাকথিত নামাজি ও রোজাদারের কৃপণতা, ফকিরের প্রতি দুর্ব্যবহার, পরিণামে একমাত্র পুত্রের নিখোঁজ হওয়া এবং ফকিরের কল্যাণে ঈদুল ফিতরের দিন সকালে হারানো পুত্রের প্রত্যাবর্তনের কাহিনি তুলে ধরেছেন।

শুধু রোজা-নামাজ পালন করলেই হয় না, গরিবদের জন্যে জাকাত-ফেতরা-সদকাও দিতে হয়। এটাই ইসলামের নিয়ম। কিন্তু কাঠমোল্লা জমিদার তা মানতে নারাজ। সে শুধু নামাজ-রোজাকেই ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করে। দানখয়রাত করলে নাকি সে নিজেই গরিব হয়ে যাবে। এ কারণে সে বাড়ি থেকে ফকিরকেও তাড়িয়ে দেয়। এই ফকিরের কল্যাণেই ঈদের দিন তার হারানো পুত্র ফিরে আসে। জমিদার ফকিরের কথা ও কেরামতিতে নিজের ভুল বুঝতে পারে। ঈদুল ফিতরের দিন তার জীবন ও মনোজগতে পরিবর্তন আসে হারানো পুত্রকে ফিরে পাওয়ার মাধ্যমে।

নজরুল অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে ইসলামের মূল মর্মটি তুলে ধরেছেন এই নাটিকায়। নাটিকায় জমিদার চরিত্রটির মাধ্যমে তিনি ধর্মীয় ও সামাজিক দিকটা শিক্ষণীয়ভাবে তুলে ধরেছেন। নাটকে ফকির চরিত্রটি রূপক। সে জমিদারের কাছে ভিক্ষার ছলে এলেও পরবর্তীকালে জমিদারের পুত্র হারানো ও পুত্র ফিরে পাওয়া এবং ধর্ম সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান থেকে তা স্পষ্ট হয়।

ঈদ (১৯৪১)

'ঈদ' শ্রুতি-নাটক কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয় ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন (১লা শাওয়াল, ১৩৬০ হিজরি, ৫ই কার্তিক, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) ভোরবেলায়। নাটিকায় অংশ নেন কাজী নজরুল ইসলাম, চিত্তরঞ্জন রায়, মুহম্মদ হোসেন খসরু, কামাল চৌধুরী, রেহানা বেগম ও আফরোজা আখতার। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই বৈশাখ ঈদ সংখ্যা *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায়।

কাজী নজরুল ইসলামের 'ঈদ' নাটিকাটি সমগ্র বাংলা মুসলিম সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এই নাটিকায় নজরুলের ইসলামি ঐতিহ্য চেতনার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে। নাটিকায় তিনজন

কাজী নজরুলের রচিত 'ঈদুল ফেতর' নাটকে অভিনয় করেন শতাব্দী ওয়াদুদ ও দীপা খন্দকার

পুরুষ ও দুজন মেয়ে চরিত্র রয়েছে। এরা হচ্ছে মহবুব, শমশের, মাহতাব, গুলশান ও বেদৌরা। এতে গান রয়েছে:

১. বিদায়বেলায় সালাম লহ লহ মাহে রমজান রোজ (মাহতাব)
২. নাই হল মা বসন ভূষণ এই ঈদে আমার (গুলশান)
৩. এল ঈদুল ফেতর এল ঈদ ঈদ ঈদ (বেদৌরা)

নাটিকার শুরুতে রয়েছে ঈদের ভোরে মাহতাবের কণ্ঠে গান। তাদের বাড়িতে আসে বন্ধু মহবুব ও শমশের। মাহতাবের বোন বেদৌরা সবার জন্য খোরমা, সেমাই, আতরদানির ব্যবস্থা করে। এক সময় তাদের সঙ্গে যোগ দেয় গুলশানও। সবাইকে নিয়ে পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন তৈরি হয় একটি অনাবিল খুশির রোমান্টিক পরিবেশ। এদের মধ্যে আলোচনা হয় রোজার মাহাত্ম্য, ঈদের আনন্দ, মহান আল্লাহর কুদরত ইত্যাদি নিয়ে। নাটিকার একটি চরিত্র শমশের যখন জিজ্ঞেস করে 'একমাস উপোস করে কী লাভ হয়?' তখন মাহতাবের কণ্ঠে উচ্চারণ:

> শমশের। আমরা যে ক্ষীর-সন্দেশ বা পোলাও কোর্মা মসজিদে পাঠাই, তা কি আল্লাখান? ঐ ক্ষীর-সন্দেশই, ফিরনীই শিরণী হয়ে ফিরে আসে আমাদের কাছে। আমাদের অশুদ্ধ দেহ-মনের দান আল্লাহর নামে নিবেদিত হয়ে শুধু ফিরে আসে। এ আল্লাহর পরীক্ষা। তার রহম ও রহমত, কৃপা ও কল্যাণ পেতে হলে আমাদের দেহ-মনকে মাঝে মধ্যে উপবাসী রাখতে হয়। এই উপবাসে দেহ-মনের ভোগের তৃষ্ণা যখন চলে যায়, তখনি ঈদের অর্থাৎ নিত্য-আনন্দের চাঁদ, পরমোৎসবের চাঁদ উঠে।

তখন শমশের স্বীকার করে, 'সত্যি, একমাস রোজা রেখে ঈদের অপূর্ব আনন্দ পাই–তা বৎসরের আর কোনোদিন পাওয়া যায় না।'

মাহতাবও তখন আবার বলে, 'হ্যাঁ, এতে দেহের রোজা, মনের রোজা রাখলে অর্থাৎ তাকে ভোগের থেকে ফিরিয়ে রাখলে দুর্ভোগ কমে যায়– শান্তি-আনন্দ আল্লাহর কাছে থেকে নেমে আসে।'

এই নাটিকায় কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছে মাহতাব। এই চরিত্রের মুখ দিয়ে আল্লাহ, রোজা, ঈদ, আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে যেসব কথাবার্তা বলা হয়েছে তাতে ইসলামি আদর্শ ও চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। মনে হয় কবি কাজী নজরুল ইসলামই যেন এই মাহতাব চরিত্রের ভেতরে লুকিয়ে আছেন।

মাহতাবের কণ্ঠে উচ্চারিত শেষ সংলাপ 'বিরহের রোজা না রাখলে কি প্রেমের চাঁদ দেখতে?' এর মধ্যে যে নিগূঢ় অর্থ রয়েছে তাতে 'ঈদ' নামটি সার্থক হয়ে উঠেছে।

মোবাশ্বের আলী লিখেছেন:

তিনি (নজরুল) হিন্দু জীবন থেকে যেমন নাটকের উপাদান গ্রহণ করেছেন, তেমনি ইসলামি জীবন থেকেও নাটকের উপাদান উপজীব্য আহরণ করেছেন। 'ঈদ' নাটিকায় মাহতাবের উক্তির মাধ্যমে ঈদের যথার্থ তাৎপর্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এই মহামিলনের ঈদগাহে সর্ব জাতিধর্ম, হানাহানি, ঈর্ষা ভেদ ভুলে সর্ব ধর্মের পূর্ণ সমন্বয়–সেই পরম পূর্ণ নিত্য পরম সনাতন আল্লাহকে একসাথে সিজদা করা– নামাজের শেষে অশ্রুসিক্ত চোখে পরস্পরকে আলিঙ্গন করব।

অনুপম হায়াৎ : লেখক ও গবেষক

বঙ্গবন্ধুকে দেওয়া হলো ফসওয়াল বিশেষ সাহিত্য পুরস্কার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দ্য ফাউন্ডেশন অব সার্ক রাইটার্স অ্যান্ড লিটারেচার (ফসওয়াল) থেকে বিশেষ সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। বঙ্গবন্ধুর– *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *কারাগারের রোজনামচা* ও *আমার দেখা নয়াচীন* বইয়ের জন্য এ অনন্য সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। ২রা এপ্রিল গণভবনে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে এ পুরস্কার হস্তান্তর করেন লেখক ও গবেষক রামেন্দু মজুমদার ও মফিদুল হক। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রেস উইং থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজনীতিবিদ হিসেবে বঙ্গবন্ধু হিমালয়ের মতো উচ্চতায় থাকলেও তিনি তাঁর লেখাতেও অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ আজ একটি বিশ্ব দলিল। তিনি আরও বলেন, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে সমগ্র জাতিকে অনুপ্রেরণাদায়ক এই ভাষণটি একটি রাজনৈতিক মহাকাব্য।

গত ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ট্রিলজি– *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *কারাগারের রোজনামচা* ও *আমার দেখা নয়াচীন* রচনার স্বীকৃতি হিসেবে 'বিশেষ সাহিত্য পুরস্কার' প্রদান করে ফসওয়াল।

বঙ্গবন্ধুকে পুরস্কারে ভূষিত করার ক্ষেত্রে সংস্থাটি বলে, ব্যতিক্রমী সাহিত্য দক্ষতা এবং ট্রিলজিতে তাঁর অসামান্য সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠত্বের জন্য তাঁকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। সংস্থাটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মহাত্মা গান্ধী এবং মার্টিন লুথার কিংয়ের সঙ্গে তুলনা করে বলেছে, এই গ্রহের কোনোও শক্তিই তাঁকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে পারবে না।

পুরস্কার হস্তান্তরের আগে পাঠ করা সম্মাননা স্মারকে বলা হয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ট্রিলজির জন্য অসামান্য সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠত্বের জন্য ৬৩তম সাহিত্য উৎসবে সার্ক সাহিত্য পুরস্কার ২০২৩ প্রদান করতে পেরে ফসওয়াল সম্মানিত বোধ করছে। এর আগে প্রখ্যাত পাঞ্জাবি ঔপন্যাসিক ও ফসওয়ালের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অজিত কৌর আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ঐ উৎসবে বাংলাদেশি লেখক ও গবেষক রামেন্দু মজুমদার ও মফিদুল হকের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন। নয়াদিল্লিতে ২৬শে মার্চ থেকে ৩ দিনব্যাপী ঐ আঞ্চলিক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য, The Foundation of SAARC Writers and Literature (FOSWAL) একটি অলাভজনক, অরাজনৈতিক সংস্থা যা ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য হলো দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক) লেখক ও সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সহযোগিতা প্রচার করা। সংগঠনটি বিভিন্ন সাহিত্য অনুষ্ঠান, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে এবং বই ও জার্নাল প্রকাশ করে। FOSWAL-এর সদর দফতর ভারতের নয়াদিল্লিতে এবং অন্যান্য সার্ক দেশে এর শাখা রয়েছে।

প্রতিবেদন: অমিত কুমার

সপরিবার বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধুর অনুপ্রেরণা

ড. শিল্পী ভদ্র

শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির পিতা ও বঙ্গবন্ধু অভিধার অধিকারী হতে পেরেছিলেন তাঁর পরিবারের আত্মত্যাগ আর জনগণের ভালোবাসায়। একদিকে রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, একে ফজলুল হক, আবুল হাসিম, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী; অন্যদিকে পিতা লুৎফর রহমান, মা সায়ারা খাতুন, তাঁর ভাই, বোন-ভগ্নিপতিগণ– সকলেই তাঁদের মতো করে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের প্রেরণা হয়ে সাথে ছিলেন। তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী শেখ ফজিলাতুন নেছা ছিলেন জাতির পিতার একনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ সাথি। জীবনের সব সমস্যার কথা তিনি তাঁর রেণুকে বন্ধুর মতো অকপটে বলতেন। রেণু শেখ ফজিলাতুন নেছার ডাক নাম আর শেখ মুজিবের ডাক নাম খোকা। রেণু শুধু খোকার ছেলেবেলার সাথিই নয়; জীবন সঙ্গী, বন্ধু, প্রেম, ভালোলাগা, ভালোবাসা, অনুপ্রেরণা– সবই। শেখ মুজিবুর রহমান আর রেণু ছিলেন অভিন্ন আত্মায় বাঁধা, একে অন্যের পরিপূরক।

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা শেখ মুজিবুর রহমানের জ্ঞাতি সম্পর্কের চাচা-চাচি শেখ জহুরুল হক এবং হোসনে আরা বেগমের কন্যা। শিশুকাল থেকেই বঙ্গবন্ধু আর রেণু একে অপরের সাথি ছিলেন। জ্ঞাতি সম্পর্কের পরেও পারিবারিক সিদ্ধান্তে খুব ছোটোবেলায় তাঁদের বিয়ে হয়। অল্প বয়সে রেণু পিতা-মাতা এবং সাত বছর বয়সে দাদা শেখ কাসেমকে হারান। বঙ্গবন্ধুর মা বেগম সায়ারা খাতুন সাত বছর বয়সি পিতৃ-মাতৃহীন রেণুকে নিজের কাছে এনে তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে শিক্ষাদীক্ষা ও গৃহকর্ম নৈপুণ্যে বড়ো করে তোলেন। তখন থেকেই রেণু শেখ মুজিবের পরিবারের ছোটো-বড়ো সবাইকে আপন করে নেন। বিশেষ করে খোকার চলাফেরা, দুরন্ত স্বভাব, ন্যায়পরায়ণ, পরোপকারী, সাহসিকতা প্রভৃতি গুণাবলি কিশোরী রেণুকেও মুগ্ধ করে। সেই সময় থেকে মানুষের যে-কোনো বিপর্যয়ে, সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে এবং অসুখ-বিসুখে শেখ মুজিবের সাথে তিনিও তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান।

মানুষের ভালোবাসা অর্জন করেই তিনি লাভ করেন 'বঙ্গমাতা' উপাধি। শেখ ফজিলাতুন নেছা একাধারে প্রেমময়ী স্ত্রী, আদর্শ মাতা, অন্যদিকে একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ ও যোদ্ধা। তিনি দেশের জন্য, মানুষের জন্য আজীবন আত্মত্যাগ করেছেন। আদর্শ, সংযম, ধৈর্য, দূরদর্শিতা প্রভৃতি গুণাবলির জন্য তিনি আজীবন বঙ্গবন্ধুর অনুপ্রেরণা, সুখ-দুঃখের সাথি হতে পেরেছিলেন।

বহুমাত্রিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এই মহীয়সী নারীর স্বামীর শিক্ষার ব্যাপারে দৃষ্টি ছিল অতন্দ্র। অর্থনৈতিক সহায়তায়ও তিনি সবসময় বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন। স্বামীর প্রতিকূল জীবনের কথা তিনি জানতেন। সে অনিশ্চয়তার জীবনে অর্থ পরম সহায়ক জেনে তিনি নিজের জন্য কোনো খরচ না করে স্বামীর কাজের জন্য টাকা জমিয়ে রাখতেন। শেখ মুজিব তাঁর সমস্যা, অর্থসংকটের কথা প্রথমে রেণুকেই বলতেন। তিনিও সমস্যা সমাধানে সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন। প্রয়োজনে নিজের পৈত্রিক জমির ধান বিক্রির টাকা দিয়ে তিনি স্বামীকে সহযোগিতা করেছেন। কোনোদিন কোনো সমস্যাতে তিনি বঙ্গবন্ধুকে দোষারোপ করেননি বা কটু কথা বলেননি। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন–

> কলকাতা যাব, পরীক্ষাও নিকটবর্তী। লেখাপড়া তো মোটেই করি না। ভাবলাম কিছুদিন লেখাপড়া করব। মাহিনা বাকি পড়েছিল, টাকা-পয়সার অভাবে। রেণুর কাছে আমার অবস্থা

> প্রথমে জানালাম। আব্বাকে বললে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন মনে হলো। কিছুই বললেন না। টাকা দিয়ে আব্বা বললেন, কোনো কিছুই শুনতে চাই না। বিএ পাস ভালোভাবে করতে হবে। অনেক সময় নষ্ট করেছ, পাকিস্তানের আন্দোলন বলে কিছুই বলি নাই। এখন কিছুদিন লেখাপড়া কর। আব্বা-মা, ভাইবোনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রেণুর ঘরে এলাম বিদায় নিতে। দেখি কিছু টাকা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। 'অমঙ্গল অশ্রুজল' বোধ হয় অনেক কষ্টে বন্ধ করে রেখেছে। বলল, 'একবার কলকাতা গেলে আর আসতে চাও না। এবার কলেজ ছুটি হলেই বাড়ি এস'। (শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৬১)

বঙ্গবন্ধুর বিএ পরীক্ষার সময়ে শেখ ফজিলাতুন নেছা গোপালগঞ্জ থেকে কলকাতা চলে আসেন কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল তিনি কাছে থাকলে বঙ্গবন্ধু নিশ্চয়ই বিএ পাস করবেন। আর সত্যি শেখ মুজিবুর রহমান বিএ পাস করেন, তাঁর বিশ্বাসের মর্যাদা রাখেন।

শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের দূরদৃষ্টি ছিল প্রখর। তাঁর স্বামী একদিন বিশ্বখ্যাত হবেন, তা যেন তিনি অন্তর্দৃষ্টিতে দেখতে পেতেন। সেজন্যই তাঁকে আত্মজীবনী লেখার জন্য বার বার অনুরোধ করতেন। শুধু অনুরোধ করেই থেমে যাননি, লেখার জন্য জেলগেটে খাতাও রেখে এসেছেন।

বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীর প্রথম পাতা শুরু করেছেন তাঁর সহধর্মিণীর কথা দিয়ে। কেননা বেগম মুজিবের তাগিদ, অনুরোধ এবং প্রচেষ্টাতেই বঙ্গবন্ধু হঠাৎ একদিন জেলখানাতেই তাঁর আত্মজীবনী লিখতে শুরু করেন। বঙ্গবন্ধু সে প্রসঙ্গে লিখেছেন–

> আমার স্ত্রী আমাকে কয়েকটা খাতাও কিনে জেলগেটে জমা দিয়ে গিয়েছিল। জেল কর্তৃপক্ষ যথারীতি পরীক্ষা করে খাতা কয়টা আমাকে দিয়েছেন। রেণু আরো একদিন জেলগেটে বসে আমাকে অনুরোধ করেছিল। 'বসেই তো আছ, লেখ তোমার জীবনের কাহিনী।' বললাম, 'লিখতে যে পারি না; আর এমন কি করেছি যা লেখা যায়! আমার জীবনের ঘটনাগুলো জেনে জনসাধারণের কি কোনো কাজে লাগবে? কিছুই তো করতে পারলাম না। শুধু এইটুকু বলতে পারি, নীতি ও আদর্শের জন্য সামান্য একটু ত্যাগ স্বীকার করতে চেষ্টা করেছি (শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১)।

বঙ্গমাতার অনুপ্রেরণা এবং প্রচেষ্টাতেই বাঙালি জাতি লাভ করেছে পাকিস্তান আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, বাঙালির স্বাধীনতা-স্বাধিকার আন্দোলন, গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নানা চক্রান্ত ইত্যাদির বিভিন্ন ঘটনা ও ইতিহাস। সেইসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর অভিজ্ঞতাজাত কায়েমি স্বার্থবাদীদের নানা ষড়যন্ত্র এবং শাসনের নামে শোষণের অপচেষ্টার এক অমূল্য দলিল। যে গ্রন্থের অনুপ্রেরণায় আগামী প্রজন্ম দেশ সেবায় ব্রতী হতে পারবে।

শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব সংসার যেমন সুষ্ঠু, সুনিপুণভাবে পরিচালনা করতেন, তেমনি সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো রক্ষণাবেক্ষণেও ছিল তাঁর আন্তরিক যত্ন। বঙ্গবন্ধুর লেখাগুলোর মূল্য, মর্যাদা তিনি বুঝতেন। তাই তিনি এই অমূল্য জিনিসগুলো অনেক মমতায়, অনেক যত্নে রাখতেন। বঙ্গবন্ধুর জীবনের নানা চড়াই-উতরাইয়ের মাঝেও তাঁর সহধর্মিণীর সতর্কতার জন্য বঙ্গবন্ধুর অমূল্য লেখাগুলো, পরবর্তীকালে তাঁর সুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক প্রচেষ্টায় জনসমক্ষে আসে।

স্বামীর রাজনৈতিক জীবনের এক আত্মত্যাগী-সহযোগী হয়ে ওঠেন বেগম মুজিব। শেখ মুজিবের রাজনৈতিক সংগ্রাম, আন্দোলন ও কারাজীবনেও তিনি এক অনুকরণীয়, ত্যাগী নারী হিসেবে আদর্শ স্থাপন করেছেন। স্ত্রী হিসেবে তাঁর জীবনকালে কখনও স্বামীকে একনাগাড়ে দুই বছর কাছে পাননি। কিন্তু কোনোদিন কোনো অভিযোগ-অনুযোগ ছিল না। জীবনে কোনো সমস্যায় কোনোদিন বিরক্ত হননি। যত কষ্টই হোক কখনও ভেঙে পড়েননি। বরং তিনি বঙ্গবন্ধুর অনুপ্রেরণা হয়ে সহযোদ্ধা হিসেবে সবসময় পাশে থেকেছেন।

১৯৫২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ মাস বিনা বিচারে আটক থাকার জন্য বঙ্গবন্ধু আমরণ অনশন ধর্মঘট করেন। অনশনের শুরু থেকে পাঁচ-ছয় দিন পরে তিনি বিছানা থেকে ওঠার শক্তি হারিয়ে ফেলেন। যখন তাঁর হার্টের অবস্থা খারাপের দিকে, ভীষণভাবে প্যালপিটিশন হচ্ছে, নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে তখন একজন কয়েদিকে দিয়ে গোপনে কয়েক টুকরা কাগজ আনান। দুর্বলতায় তাঁর হাত কাঁপে তথাপি এ সময় ছোটো ছোটো করে চারটা চিঠি লিখেন– আব্বার কাছে, রেণুর কাছে, শহীদ সাহেব আর ভাসানী সাহেবের কাছে।

অনশনে যখন তিনি মৃত্যুর দুয়ারে তখনও তিনি তাঁর বাবা, মা, ভাইবোন, রাজনৈতিক গুরুদের কথা ভেবেছেন। বিশেষত প্রিয়তমা স্ত্রী রেণুর দশা কী হবে? তাঁর তো কেউ নাই দুনিয়ায়। ছোটো ছেলেমেয়ে দুটার অবস্থাই বা কী হবে? তাঁদের মুখটা একটু দেখতেও চেয়েছিলেন।

এদিকে শেখ মুজিব আমরণ অনশনের আভাস-বার্তা আগেই রেণুকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন। স্বামীর চিঠি পেয়ে বেগম

সহধর্মিণী শেখ ফজিলাতুন নেছার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু

ফজিলাতুন নেছা তাঁকে দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এরপর সংবাদপত্রে এ সম্পর্কিত খবর জানেন রেণু। তাঁর চরম উদ্বিগ্নতাতেই লুৎফর রহমান, সায়ারা খাতুন, রেণু, হাসিনা ও কামালকে নিয়ে সোজা ঢাকায় রওয়ানা করেন। তাঁদের ঢাকা যাওয়ার দুদিন পর ঢাকা জেলগেট থেকে বঙ্গবন্ধু কোথায় আছেন, সে খোঁজ পান। সংকটাপন্ন অবস্থাতে পিতা লুৎফর রহমান ফরিদপুর জেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারি সকাল দশটায় নিজ দায়িত্বে তাঁর খোকাকে বাড়ি নিয়ে আসেন এবং সর্বোচ্চ ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে পুত্রকে সুস্থ করেন।

অনশনের পরে বাড়ি ফিরে শেখ মুজিব তাঁর মা এবং স্ত্রীর উৎকণ্ঠাজড়িত প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিতে পারেননি। রেণু খুব চাপা স্বভাবের হলেও অনশনের পরে স্বামীকে ফিরে পেয়ে কেঁদে ফেলেন। রেণুর সেসব প্রশ্নোত্তর শেখ মুজিবের জানা ছিল না। তিনি শুধু তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর ভালোবাসা অনুভব করেছিলেন তাঁর কান্নাজড়িত অভিযোগের মধ্য দিয়ে। তাঁর রেণুর ভালোবাসা ভরা অনুযোগ সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর ভাষ্যে–

> কেন তুমি অনশন করতে গিয়েছিলে? এদের কি দয়া মায়া আছে? আমাদের কারও কথা তোমার মনে ছিল না? কিছু একটা হলে কি উপায় হত? আমি এই দুইটা দুধের বাচ্চা নিয়ে কি করে বাঁচতাম? হাচিনা, কামালের অবস্থা কি হত? তুমি বলবা, খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট তো হত না? মানুষ কি শুধু খাওয়া পরা নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়? আর মরে গেলে দেশের কাজই বা কিভাবে করতা?' আমি তাকে কিছুই বললাম না। তাকে বলতে দিলাম, কারণ মনের কথা প্রকাশ করতে পারলে ব্যথাটা কিছু কমে যায়। রেণু খুব চাপা, আজ যেন কথার বাঁধ ভেঙে গেছে। শুধু বললাম, 'উপায় ছিল না' (শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ২০৭)।

উপরের কথোপকথন থেকেই বোঝা যায়, শেখ মুজিব আর রেণুর আন্তরিক আবেদন কত গভীর, কত নিবিড়।

বঙ্গবন্ধু ১৯৫৬ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৫৭ সালের ৩০শে মে পর্যন্ত শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতিরোধ ও গ্রামীণ সহায়তা বিষয়ক মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। সন্তানদের লেখাপড়ার সুবিধার জন্য বেগম মুজিব ঢাকায় চলে আসেন। এসে সবে সংসার গোছাচ্ছেন তখনই বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হন। বেগম মুজিব তবু ভেঙে পড়েননি। বঙ্গবন্ধু রেণুর মতামতকে সম্মান করতেন এজন্য তিনি তাঁর বন্ধু ইয়ার মোহাম্মদ খানকে বলেছিলেন, রেণু গোপালগঞ্জে যেতে না চাইলে একটা বাড়ি ভাড়া করে দিতে। বেগম মুজিব সব কষ্ট সহ্য করে ঢাকাতেই থাকেন। রেণু ঢাকাতে থেকে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর সব রকম কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করেন।

একদিকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে নিয়মিত জেলে সাক্ষাৎ করে বঙ্গবন্ধুর মনোবল অটুট রাখা, সংসারের দায়িত্ব, ছেলেমেয়েদের যথাযথ ভাবে মানুষ করা; সর্বোপরি আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সাংগঠনিক দায়িত্বও তিনি নিরলসভাবে পালন করেন। অন্যদিকে আইনজীবীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মামলার খোঁজখবর নিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর রেণু। নিজের সোনার অলংকার বিক্রি করেও মামলার খরচ জুগিয়েছেন। নিজেকে বঞ্চিত করে তিনি স্বামীর আদর্শ ও সংগঠনের জন্য নিজের সম্বল প্রায় সবই বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, তাঁর স্বামী দেশের জন্য কাজ করছেন, মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করছেন। টাকার অভাব, সংসার চালাতে হচ্ছে, আওয়ামী লীগের নেতাদের সাহায্য দরকার, কেউ অসুস্থ তাকে টাকা দিতে হচ্ছে। কিন্তু কখনই এসব কথা কাউকে বলতেন না। নীরবে কষ্ট করে সমস্যার সমাধান করেছেন। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে পদে পদে তিনি আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে গেছেন। প্রকাশ্যে, প্রচারে কখনই আসেননি।

বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব– তিনটি নামই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু; কিন্তু এই নেতৃত্বকে সহায়ক শক্তি, নির্যাতন-বরণের ধৈর্য ও প্রেরণা জুগিয়েছেন এই মহীয়সী, সংগ্রামী নারী। ক্ষমতার খুব কাছাকাছি থেকেও সুখশান্তি তাঁর কাছে বড়ো হয়ে ওঠেনি। ত্যাগের মনোভাব নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে অনুপ্রেরণা ও শক্তি জুগিয়েছেন। রাজনৈতিক ও জাতীয় সংকট উত্তরণে দিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

স্বামীর পাশে থেকে মানবতার জন্য কাজ করে গেছেন। জীবনে ঝুঁকি নিয়েছেন বহুবার। আড়াল থেকেই তিনি বাংলার মানুষের সেবা করে গেছেন আজীবন। বাংলাদেশের অভ্যুদয়-সংগ্রামের ইতিহাসে, বিভিন্ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছার বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৭ই মার্চে ভাষণ দিতে যাওয়ার প্রাক্কালে শেখ ফজিলাতুন নেছার বক্তব্যের স্মৃতিচারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য–

> আমার মা আব্বাকে বললেন, সমগ্র দেশের মানুষ তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সবার ভাগ্য আজ তোমার ওপর নির্ভর করছে। তুমি আজ একটা কথা মনে রাখবে, সামনে তোমার লাঠি, পেছনে বন্দুক। তোমার মনে যে কথা আছে তাই তুমি বলবে। অনেকে অনেক কথা বলতে বলেছে। তোমার কথার ওপর সামনের অগণিত মানুষের ভাগ্য জড়িত, তাই তুমি নিজে যেভাবে যা বলতে চাও নিজের থেকে বলবে। তুমি যা বলবে সেটাই ঠিক হবে। দেশের মানুষ তোমাকে ভালবাসে, ভরসা করে– মায়ের একথাগুলো আজো আমার কানে বাজে। কত বাস্তবধর্মী চিন্তা-ভাবনা তিনি করতেন এবং একজন নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক তিনি ছিলেন। স্বাধীনতার প্রশ্নে ছিলেন আপোশহীন। (ড. আবদুল ওয়াহাব, সম্পা. *বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ইতিহাস ও তত্ত্ব*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, *কিছু স্মৃতি*, শেখ হাসিনা, পৃ. ৯১-৯২)

যে মহীয়সী নারীর এমন দৃঢ়প্রত্যয়ী মনোভাব এবং সাহস জোগানোর ফলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চের অমর ভাষণ দিয়েছিলেন, বাঙালি জাতিকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন, সেই ৭ই মার্চের ভাষণের নেপথ্য শক্তি ছিলেন– বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম যেমন স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবে চিরকাল ইতিহাসের পাতায় অম্লান থাকবে, তেমনি তাঁর প্রিয়তমা পত্নী 'বঙ্গমাতা' শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে বাঙালি জাতি চিরকাল শ্রদ্ধায় স্মরণ করবে। বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম ও আদর্শ, জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে তিনি জাতির পিতা এবং বাঙালি জাতির অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে।

ড. শিল্পী ভদ্র: লেখক ও গবেষক, drshilpi.dipa@gmail.com

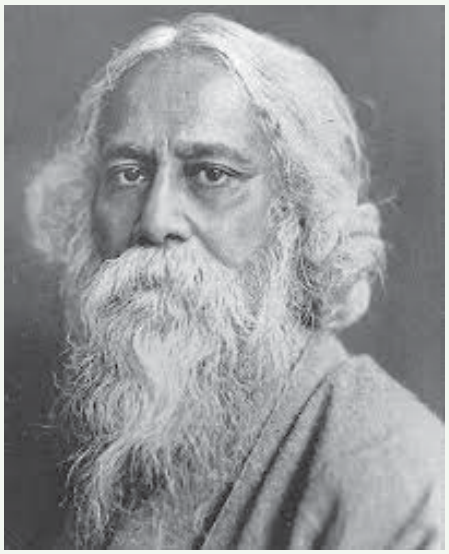

‘সামান্য ক্ষতি’ বনাম রাজা ও রাজধর্ম

মাসুদ সিদ্দিকী

এক বহুমুখী বিস্ময়কর কবি প্রতিভার অধিকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর ‘সামান্য ক্ষতি’ কাহিনি-কবিতার সাথে আমরা সকলেই পরিচিত আছি। যেমন আমার সমবয়সি অন্য অনেকের, তেমনি আমারও এটি ছেলেবেলায় কণ্ঠস্থ ছিল। জীবনে বহুবার এই কবিতাটি আবৃত্তি করার উৎসাহ আমি পেয়েছি। এখনও পাই। বর্ণনাধর্মী কবিতা বাংলা ভাষায় যত ভালো হতে পারে, এ কবিতাটি ততটাই ভালো। এখানে রাজরানির অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাজধর্মের অবিচল ন্যায়বিচারের ঘোষণার কথা প্রবলভাবে উচ্ছ্বসিত হয়েছে। আমরা আবিষ্ট হই কবিতাটির পদলালিত্যে ও বাণীর নিগূঢ় ব্যঞ্জনার্থে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একবার বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের গদ্য, কবিতা, কাহিনির গুণেই আদরণীয়। একটি ধারণাকে নিয়ে কবিতা লেখার ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের কেমন সহজাত ও অত্যাজ্য ছিল ‘সামান্য ক্ষতি’ কবিতাটি তারই একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

আজ থেকে শত শত বছর আগের ঘটনা। ভারতের ছোটো একটি রাজ্য কাশি। মাঘ মাসের এক সকালে কাশির রানি করুণা শত সখীকে সাথে নিয়ে স্নান করতে গেলেন বরুণা নদীতে। স্নান শেষে রানি শীতে কাতর হলেন। সখীদের নির্দেশ দিলেন আগুন জ্বালাতে। কাছে আগুন জ্বালাবার কাঠ না পাওয়ায় রানি দূরে দৃশ্যমান প্রজাদের জীর্ণ কুটিরে আগুন দিতে বললেন। আগুনের লেলিহান শিখায় প্রজাদের জীর্ণ কুটির ভস্মীভূত হলো। আগুনের উত্তাপে শীত নিবারণ করে প্রমোদমত্ত রানি আনন্দে রাজগৃহে ফিরে আসেন। সেদিন রাজদরবারে বিচারের আসনে বসেছিলেন স্বয়ং রাজা ভূপতি। গৃহহীন প্রজারা দলবেঁধে করজোড়ে রাজার সামনে এসে দাঁড়াল। অভিযোগ শুনে শরমে রাজার মুখ লাল হলো। তিনি অন্দরমহলে গিয়ে রানির কাছে এই অন্যায় আচরণের কৈফিয়ত চাইলেন। বললেন, ‘মহিষী, এ কি ব্যবহার!/ গৃহ জ্বালাইলে অভাগা প্রজার/ বলো কোন রাজধরমে!’ রানি উদ্ধত ভঙ্গিতে জবাব দিলেন, ‘গৃহ কহ তারে কোন বোধে/ গেছে গুটি জীর্ণ কুটির/ কতটুকু ক্ষতি হয়েছে প্রাণীর ?/ কত ধন যায় রাজ মহিষীর এক প্রহরের প্রমোদে।’ রাজা বিচারের রায় ঘোষণা করলেন। বললেন, ‘দীনের কুটিরে দীনের কি হানি/ বুঝিতে নারিবে তাহা জানি।’ তারপর রাজার নির্দেশে একজন কিংকরী এসে রাজরানির অরুণ বরুণ শাড়ি নির্মম করে টেনে খুলে ফেলে দিলো। পরিবর্তে পরিয়ে দেওয়া হলো ভিখারি নারীর চিরবাস। রাজা রানি বলে তাঁকে কোনো ছাড় দিলেন না। মহিষীকে পথে নামিয়ে দেওয়া হলো। বলা হলো, প্রজাদের দুয়ারে দুয়ারে এক বছর ভিক্ষা করে সে অর্থ দিয়ে প্রজাদের জীর্ণ কুটির তৈরি করে দিতে। প্রজাদের প্রতি রাজার এই মর্মস্পর্শী সহানুভূতি ও রানির বিচার আমাদের মনকে শান্ত করে। মানবিক বেদনার সংস্পর্শে রাজা ও রাজধর্মের সুশাসন, ন্যায়বিচারের ধারণাটি এ কবিতায় নতুন মাত্রা পেয়েছে।

রাজধর্ম অতি কঠিন একটি কাজ। প্রজাপালন তার অনিষ্ঠ। রাজার কাজ হলো দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। প্রাচীন ভারতে রাজধর্ম পালনের একটি আদর্শ বিদ্যমান ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজার কর্তব্য বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। তিনি বলেন, একজন রাজা সর্বসময়ে তার দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত থাকবেন। তিনি জনস্বার্থে নিজেকে উৎসর্গ করবেন। প্রজার সুখের মাঝে রাজার সুখ নিহিত। প্রজার কল্যাণ ও মঙ্গলের মধ্যেই রাজার কল্যাণ ও মঙ্গলকে খুঁজতে হবে। যেসব বিষয় প্রজাদেরকে খুশি করে, সেসব বিষয়ের ওপর রাজার ভালো বা কল্যাণ মিশে থাকে। সেজন্য সকল সময় রাজাকে সক্রিয়, কর্মপরায়ণ, কর্মিষ্ঠ থাকতে হবে। রাজ্যের সমৃদ্ধি, সাফল্য, উন্নতির জন্য রাজাকে সংগ্রাম, লড়াই করতে হবে। কারণ সাফল্য নির্ভর করে প্রচেষ্টার ওপর। প্রচেষ্টা না থাকলে রাজ্যে নেমে আসবে ব্যর্থতা, বিফলতা।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের একজন শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন সম্রাট অশোক। তাঁর শাসনের মূল লক্ষ্য ছিল প্রজাদের মঙ্গলসাধন। তিনি ঘোষণা করেন সকল মানুষ তাঁর কাছে সন্তানতুল্য। মানুষের শান্তির জন্য রাস্তার দুপাশে তিনি ছায়াদানকারী বৃক্ষ রোপণ করেন। প্রজাদের জলতৃষ্ণা নিবারণের জন্য কূপ খনন করেন। প্রজাদের অভিযোগ শোনা ও তার প্রতিকারের জন্য তিনি সরাসরি প্রজাদের সাথে সাক্ষাৎকারের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বলেন, ‘সকল মানুষই আমার সন্তান, আমি যা করছি তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে ইহজগৎ ও পরজগতে সুখী করা। এই কর্তব্য সম্পাদন করে আমি জীবের প্রতি আমার ঋণ শোধ করতে চাই।’ তাঁর ধর্ম প্রচারের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল পরধর্ম-সহিষ্ণুতা।

ভারতের ইতিহাসের অদ্বিতীয় শাসক ও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন মহামতি আকবর। তাঁর রাজধর্ম ছিল গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক। শত শত বছর আগে তিনি ঘোষণা করেন একটি রাষ্ট্র পরিচালনার সময় রাষ্ট্র সকল সময় ধর্মীয় নিরপেক্ষতা পালন করবে। এই আদর্শ হচ্ছে একটি দেশের স্থায়ী মূল্যবোধ। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক নীতির ভিত্তিতে সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। আকবর তাঁর বিবেচনার ক্ষেত্রে সর্বসময় যুক্তিকে প্রাধান্য দেন। ১৫৯১-১৫৯২ সালে আকবর তাঁর প্রণীত নীতি ঘোষণা করেন। এই সময়ে ইউরোপে ধর্ম বিচ্যুতি দমন আইন কার্যকর ছিল। এই আইনের অধীনে রোমের গির্জা কর্তৃক সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রচলিত ধর্ম বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করায় সন্তব্রুনোকে খুঁটির সাথে বেঁধে দগ্ধ করে হত্যা করা হয়। আর একই সময়ে ভারতের আগ্রায় বসে মহামতি আকবর ধর্মীয় সহনশীলতার বাণী লিপিবদ্ধ করেন। তিনি ছিলেন সহনশীল, বহুত্ববাদী শাসক। ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্য আকবরের হাতে দৃঢ়, সরকারি সমর্থন লাভ করে। তিনি বৈষম্যমূলক জিজিয়া

সামান্য ক্ষতি

(দিব্যাবদান মালা)

বহে মাঘমাসে শীতের বাতাস
স্বচ্ছসলিলা বরুণা।
পুরী হতে দূরে গ্রামে নির্জ্জনে
শিলাময় ঘাট চম্পকবনে ;
স্নানে চলেছেন শত সখীসনে
কাশীর মহিষী করুণা।

সে পথ সে ঘাট আজি এ প্রভাতে
জনহীন রাজশাসনে।
নিকটে যে ক'টি আছিল কুটীর
ছেড়ে গেছে লোক, তাই নদীতীর
স্তব্ধ গভীর, কেবল পাখীর
কূজন উঠিছে কাননে।

কর প্রথার বিলোপ করেন। হিন্দু বুদ্ধিজীবী, সংগীত শিল্পীদেরকে রাজদরবারে সাদরভাবে গ্রহণ করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিখ্যাত সংগীতকার তানসেন। অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করে তিনি হিন্দু জেনারেল মানসিংহকে তাঁর সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন। আকবরের এই ধর্মনিরপেক্ষতার স্বপ্ন ও আদর্শ বিশ শতকে মহাত্মা গান্ধী, নেহেরু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্বপ্ন ও কর্মে স্থায়ী রূপ লাভ করে। জওহরলাল নেহেরু আকবরকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক বলে আখ্যায়িত করেন। অনেকে মনে করেন, আধুনিক ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের সংযোজন পশ্চিমা ধারণার ফসল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে প্রায় চারশত বছর আগে এই ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের ধারণা দিয়েছিলেন ভারতের একজন মুসলিম শাসক। আকবর এই সহনশীল সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের চেয়ে যুক্তিকে প্রাধান্য দেন। যুক্তি ছিল তাঁর কাছে সর্বোচ্চ, পরম, সর্বপ্রধান। আকবরের রাজধর্ম, চিন্তাভাবনা বর্তমান সময়ে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। মানুষের জ্ঞান, শিক্ষা, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন সময়ের অগ্রগামী একজন প্রজারঞ্জক শাসক।

কালস্রোতে রাজা ও রাজধর্মের রূপ বার বার বদলায়। কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁর 'রাজা ও রাজশক্তি' প্রবন্ধে বলেন, 'হীরকমণ্ডিত মুকুট, স্বর্ণমণ্ডিত সিংহাসন, আভরণের ন্যায় রাজদণ্ড, রণ-ভেরী, রণ-মাতঙ্গ, সুসজ্জিত দেহরক্ষক, সংখ্যাতীত সৈনিক, সৈনিকদের মার্জিত অস্ত্র-শস্ত্র, ইহার কিছুই রাজতা নহে। রাজতা একটি শক্তি এবং সেই শক্তি জনসাধারণের সমবেত– শক্তির অথবা সমবেত-বল।'

জনগণের সমবেত শক্তির প্রতীক ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৪৭-এ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ হয়। সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের সেই দুঃসময়ে তিনি ছিলেন বিস্ময়করভাবে ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্ম নয়, মানুষ পরিচয়টিই তাঁর কাছে বড়ো হয়ে ওঠে। ১৯৪৬-এর হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় তিনি উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে সমানভাবে রক্ষা করেন। ১৯৫০-এর দশকে দুর্ভিক্ষের সময় লঙ্গরখানা খুলে অনাহারী মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিয়েছেন। সকল ধর্মের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম পরিবর্তন করে 'আওয়ামী লীগ' নামকরণ করেন। তাঁর অসাধারণ কীর্তি হলো জাতিকে একটি অনবদ্য সংবিধান উপহার দেওয়া। স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানেরও একটি মূল আদর্শ হলো ধর্মনিরপেক্ষতা। তিনি আজীবন রাজনীতি করেছেন দেশের মানুষের জন্য। তাঁর স্বপ্ন ছিল বাঙালির স্বাধিকার। তিনি ছিলেন স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি, রাষ্ট্রনায়ক ও জাতির পিতা। এ দেশের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই ছিল তাঁর বৈচিত্র্যময়, সংগ্রামী জীবনের লক্ষ্য। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ লক্ষ লক্ষ মানুষকে তিনি জানিয়ে দেন স্বাধীনতাই বাঙালি জাতির একমাত্র গতিপথ।

রাজার লক্ষ্য হবে দেশ ও জনগণের উন্নতি বিধান। বঙ্গবন্ধু দেশ থেকে মিথ্যা ও হিংসার রাজনীতির উচ্ছেদ চেয়েছিলেন। মেকিয়াভেলি তাঁর *The Prince* বইয়ে রাজা ও রাজনীতির যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এটাকে বঙ্গবন্ধু কখনো আদর্শ ভাবেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন রাজনীতি দুর্নীতি, স্বার্থপূরণ, শ্রেণিশোষণ, পরিবেশ বিনষ্ট করে ধন উৎপাদন এবং দরিদ্র ও দুর্বলদেরকে বঞ্চিত করে ধন বণ্টনের ক্ষেত্র নয়। তিনি গান্ধীর মতোই মহাত্মা ছিলেন। দেশের মানুষের সুখ-দুঃখকে তিনি আপনার করে নিতেন। বাঙালির মজ্জাগত ভীরুতাকে তিনি জয় করতে শিখিয়েছেন। হাজার বছর ধরে বাঙালি জাতি মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারেনি। আমরা ছিলাম নিজ গৃহে পরবাসী। বঙ্গবন্ধু বাঙালিকে সকল ভীরুতা থেকে মুক্ত করেন। পরাধীনতাকে ভেঙে বিদেশি শাসকদের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে আমাদেরকে তাঁর তোপের আগুনে জ্বলে উঠতে শিখিয়েছেন। বস্তুত বঙ্গবন্ধু ছিলেন জনগণের রাজা।

ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্নে শেখ হাসিনা দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর মতো তার শাসনের মূলমন্ত্র হচ্ছে মানবধর্ম। দেশের কাছে তার চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তিনি তাঁর বাবা-মা-ভাই ও স্বজনদের হারিয়েছেন। নিঃস্ব অবস্থায় ১৯৮১ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন। তখন তিনি জানেন না কোথায় তিনি থাকবেন। তাঁর অনিশ্চিত জীবন কোথায় শেষ হবে। তাঁর জীবন কীভাবে চলবে। কিন্তু তাঁর মাঝে আছে অনমনীয় মনোবল। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সত্যের পরীক্ষার জন্য তিনি দীর্ঘ নৈতিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিলেন। আন্দোলন করতে গিয়ে তাঁর কারাবাস হলো। গ্রেনেড হামলা করে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। তিনি দমলেন না। মনোবল অটুট রাখলেন। অসাধারণ তাঁর সহ্যশক্তি। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠন করে তিনি মাঠে নামলেন। তাঁর নেতৃত্বে এদেশের মানুষ উত্তাল হয়ে উঠল। তিনি তাঁর জীবনকে এদেশের মানুষের মুক্তির জন্য উৎসর্গ করেছেন। তিনি সরল জীবনযাপন করেন। তাঁর জীবনদর্শনের পেছনে বঙ্গবন্ধুর প্রেরণা অনুক্ষণ জাগ্রত। এদেশের শ্যামল মাটি রঞ্জিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর রক্তে। তাই বৃহত্তর সত্যে উত্তরণের জন্য তাঁর এই দীর্ঘ সংগ্রাম। তাঁর এই মহত্তর সংগ্রাম আমাদের বৃহৎকে, মহৎকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে। শেখ হাসিনা এদেশকে খাদ্যে স্বাবলম্বী করেছেন। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করেছেন। গৃহহীন মানুষকে ঘর দিয়েছেন। জনগণের শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা নিয়েছেন। আমাদের জাতীয় আয় বেড়েছে। দেশের যে-কোনো সমস্যাকে তিনি নৈপুণ্যের সাথে সমাধান করেন। তাঁর চরিত্রে অনেক অতুলনীয় গুণের সমাহার ঘটেছে। তাঁর মহত্ত্ব, অবিসংবাদিত, মানবিকতা সর্বব্যাপী এবং ধর্মনিরপেক্ষতা প্রশ্নাতীত। বাংলাদেশের মানুষের সুখ-সাধনকেই তিনি তাঁর জীবনের একমাত্র মহাব্রতজ্ঞান মনে করেন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য বাংলাদেশের জনগণের সর্ববিধ মুক্তি ও উন্নয়ন। উপরে যে কথাগুলো আমি বললাম তার পরিপ্রেক্ষিতে জনৈক লেখকের ভাষায় বলি, 'ইহার পরও কি জিজ্ঞাসা করিবে যে, পৃথিবীতে রাজা কে, আর রাজশক্তি কী ?'

মাসুদ সিদ্দিকী: সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পহেলা বৈশাখ বাঙালির উৎসব

বিভুরঞ্জন সরকার

ভোরের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার রমনার বটমূলে সমবেত কণ্ঠে 'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো' গানের মাধ্যমে বৈশাখ বন্দনা বা বাংলা বর্ষবরণের শুরু হয়েছিল গত শতকের ষাটের দশকে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন ও সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে (১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ) রাখঢাক না করে যখন পাকিস্তান সরকারের একাধিক মন্ত্রী, পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান রবীন্দ্রবিরোধী বক্তব্য দেওয়া শুরু করে, তারই প্রতিবাদে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার কথা ভাবতে হয় শিল্পীদের। ছায়ানটের শিল্পীদের মতামতের ভিত্তিতে ১৯৬৭ সালের খোলামঞ্চে গান গাওয়ার বিষয়টি সামনে আসে। তবে এর পক্ষে ও বিপক্ষে মত থাকলেও পক্ষেই ছিলেন বেশি। ছায়ানট গড়ে তোলার উদ্যোক্তাদের একাধিকজনের স্মৃতিচারণ থেকে যা জানা যায়, তা এরকম : প্রকৃতিপ্রেমিক ড. নওয়াজেশ আহমদের ওপরে ভার দেওয়া হয় একটি গাছ খোঁজার, যার নীচে বসে গান গাওয়া যায়। ড. নওয়াজেশ খোঁজখবর নিয়ে ওয়াহিদুল হককে রমনার বটমূলের কথা জানান। সেটি আসলে বটগাছ ছিল না, সেটা ছিল অশ্বত্থ গাছ। কিন্তু বলা ও শোনার সুবিধা বিবেচনা করে অশ্বত্থ গাছটিকেই বটগাছ বলে চালিয়ে প্রথম বছরের অনুষ্ঠানটি করা হয়। এ নিয়ে শুরুতে একটু দ্বিধা থাকলেও 'বটমূল' নাম গ্রহণে কারও কাছ থেকেই প্রবল আপত্তি ওঠেনি।

জঙ্গল ভর্তি রমনা অনুষ্ঠান করার উপযোগী না হলেও শান্ত, কোলাহলমুক্ত বলে অনুষ্ঠান করার জন্য সেই জায়গাই নির্বাচন করা হয়েছিল। সারারাত আলো জ্বেলে ছায়ানটের কর্মীরা সেই জঙ্গল, ঘাস পরিষ্কার করে প্রথমবারের বর্ষবরণের অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিলেন। প্রথমবারের মতন খোলা মঞ্চে সমবেত কণ্ঠে ছায়ানটের শিল্পীদের কণ্ঠে গীত হয়েছিল, 'আলোকের এই ঝরনাধারায় ধুইয়ে দাও'। সেই থেকে ছায়ানট তার সুরের ধারায় প্রতিবছর মাতিয়ে রেখেছে রমনার বটমূল। খোলা মঞ্চে গান গাওয়া যায় না বলে ছায়ানটের শিল্পীদের নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল সে সময়ে। প্রথমবারের মেলায় জনসমাগম তেমন না হলেও তারপর থেকে প্রতিবছরই জনসমাগম ক্রমে বেড়েছে এবং পহেলা বৈশাখের এই অনুষ্ঠান অব্যাহত রেখেছে ছায়ানট। ধীরে ধীরে এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে জমে উঠতে থাকে বৈশাখি মেলা। ছায়ানটের বর্ষবরণের এই অনুষ্ঠান যে এখন বাঙালির জাগরণের ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে তা কিন্তু সহজে হয়নি। অনেক বাধা ছিল। বিরুদ্ধে অপপ্রচার ছিল। একে 'হিন্দুয়ানি' প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা ছিল।

কিন্তু সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীলতাকে পরাভূত করে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে বাঙালির 'সাংস্কৃতিক দ্রোহ'। শুধু ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের কারণে এবং ২০২০-২০২১ দুই বছর করোনার জন্য ছায়ানটের বাংলা নববর্ষ আবাহনের এই অনুষ্ঠান বন্ধ ছিল। আগেই বলেছি, প্রতিবছরই রমনায় জনস্রোত বেড়েছে। গত কয়েক বছর থেকে একসঙ্গে যুক্ত হয়েছে চারুকলা ইনস্টিটিউটের মঙ্গল শোভাযাত্রা।

পহেলা বৈশাখে বিষণ্নতা নয়, অবসাদ নয়– সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মাততে চায় বাঙালি। চিত্তকে ভয়শূন্য রেখেই অনেকে মেতে উঠবে বৈশাখি উৎসব। সীমার মাঝেই তো হয় অসীমের সন্ধান। বাধার মুখে কিংবা প্রতিকূল পরিবেশে বাঙালি সৃজনশীলতার পরিচয় দানে সক্ষমতা সব সময়ই দেখিয়েছে।

আমরা এটাও জানি যে, পহেলা বৈশাখ বাঙালির উৎসবের দিন, আনন্দের দিন, সম্প্রীতির দিন, সৌহার্দ্যের দিন। পহেলা বৈশাখ মানে হালখাতা, পহেলা বৈশাখ মানে গ্রাম্যমেলা। নাগরদোলা, হাওয়াই মিঠাই, বাতাসা, পুতুল নাচ, গান, সার্কাস, মুখোশ, নৃত্য– আরও কত কী! আজকাল আয়োজনে ব্যাপকতা এসেছে, এসেছে কিছুটা পরিবর্তনও। কিন্তু পহেলা বৈশাখ বর্ষবরণকে কেন্দ্র করে বাঙালির আবেগ ও ভালোবাসা আছে চির জাগরুক। শুভ নববর্ষ বলে একে অপরের শান্তি, সুখ, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনায় কোনো পরিবর্তন নেই, ব্যত্যয় নেই।

পহেলা বৈশাখের উৎসবটা প্রকৃত অর্থেই সবার, সব বাঙালির, ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে বাঙালির উৎসব বর্ষবরণ। সে হিসেবে বর্ষবরণের উৎসবই হওয়ার কথা বাঙালির প্রধান জাতীয় উৎসব। পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন নিয়েও বিভেদ-বিভ্রান্তির অপচেষ্টা আছে, ছিল। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির কৃষ্টি-ঐতিহ্যকে অবদমনের চেষ্টা করেছে। একে 'হিন্দুয়ানি' বলে প্রচার করেছে। তবে বাঙালি সেটা মানেনি। পহেলা বৈশাখকে একটি অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ উৎসব হিসেবেই পালন করছে। বাধা দিলে বাধা না মানাই হলো বাঙালির এক সহজাত প্রবণতা। পহেলা বৈশাখ পালনে বাধা দিয়ে পাকিস্তানিরা বাঙালিকে হারাতে পারেনি, নিজেরাই হেরেছে। বাঙালির রক্তে আছে দ্রোহ, এ রক্ত পরাভব মানে না। 'জ্বলে পুড়ে ছারখার তবু মাথা নোয়াবার নয়'। বাঙালি বিশ্বাস করে– মুছে যাবে গ্লানি, ঘুচে যাবে জরা, অগ্নিস্নানে শুচি হবে ধরা।

এক বছর আগে বাংলা নববর্ষ বরণের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবহমানকাল ধরে বাঙালির পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনের ইতিহাস তুলে ধরে বলেন,'বিভিন্ন ধর্মে-বর্ণে বিভক্ত হলেও ঐতিহ্য ও কৃষ্টির জায়গায় সব বাঙালি এক এবং অভিন্ন। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে অনেক ঐতিহ্য হারিয়ে গেলেও পহেলা বৈশাখে নববর্ষ উদ্‌যাপন এখনও স্বমহিমায় টিকে আছে। সারা বছরের ক্লেদ-গ্লানি, হতাশা ভুলে এদিন সব বাঙালি নতুন আনন্দ-উদ্দীপনায় মেতে ওঠেন।'

বাঙালির মুখের ভাষা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে উপজীব্য করেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছিল বলে মন্তব্য করে শেখ হাসিনা বলেন, 'যার উপর ভিত্তি করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। কাজেই আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা মানে আমাদের স্বাধীনতাকেই অস্বীকার করা।'

'সকল সংকীর্ণতা, কূপমণ্ডূকতা পরিহার করে উদারনৈতিক জীবন-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পয়লা বৈশাখ আমাদের অনুপ্রাণিত করে' বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মনের ভিতরের সকল ক্লেদ, জীর্ণতা দূর করে আমাদের নতুন উদ্যমে বাঁচার শক্তি জোগায়, স্বপ্ন দেখায়। আমরা যে বাঙালি, বিশ্বের বুকে এক গর্বিত জাতি, পয়লা বৈশাখের বর্ষবরণের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে এই স্বাজাত্যবোধ এবং বাঙালিয়ানা নতুন করে প্রাণ পায়, উজ্জীবিত হয়।' তাঁর দেওয়া এই বক্তব্য 'সংকীর্ণতা, কূপমণ্ডূকতা পরিহার করে উদারনৈতিক জীবন-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পয়লা বৈশাখ আমাদের অনুপ্রাণিত করে' বলে প্রধানমন্ত্রী যে বক্তব্য দেন, তা যেন বাস্তবায়িত হয়।

আমাদের জীবনে দুঃখ-বেদনা আছে। জয়ের আনন্দের পাশাপাশি সাময়িক পরাজয়ের কাতরতাও আছে। আমরা পাই, আবার পেয়েও হারাই। কিন্তু এগিয়ে যাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অবদমিত হয় না। পুরাতন বছরকে বিদায় দিয়ে নতুন বছরকে আমরা বরণ করি। বৈশাখ চির নতুনকেই ডাক দিতে এসেছে। আমরা নতুন করে সংকল্পবদ্ধ হব, মরার আগে মরব না, আমরা ভয় করব না। আমরা মানুষ হয়ে ওঠার সাধনা করব। মনুষ্যত্বের জয়গান গাইব। যে-কোনো পশ্চাৎগামিতাকে প্রতিরোধ করে, আঁধারের বুকে আলো জ্বালানোর প্রতিজ্ঞা নিয়েই আমরা আবাহন করব নতুন বছরকে– ১৪৩০ বঙ্গাব্দকে। শুভ নববর্ষ। জয় হোক বাঙালির। জয় হোক মানুষের।

বিভুরঞ্জন সরকার: কলামিস্ট, প্রাবন্ধিক ও সিনিয়র সাংবাদিক

বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ সূচকে বাংলাদেশের ২ ধাপ অগ্রগতি

বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ সূচকের (জিটিআই) সর্বশেষ সংস্করণ অনুসারে, দুই ধাপ নেমে বাংলাদেশ এখন ১৬৩টি দেশের মধ্যে এই সূচকের ৪৩তম স্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ায় সন্ত্রাসবাদের প্রভাবের দিক থেকে অগ্রগতি অর্জনকারী দ্বিতীয় দেশ।

জিটিআই সূচকে বাংলাদেশ ৩.৮২৭ স্কোর পেয়েছে। স্কোরের জন্য গণনায় পাঁচ বছরের সময়কাল ধরে সন্ত্রাসের কারণে মৃত্যু, অন্যান্য ঘটনা, জিম্মি ঘটনা এবং আহতদের বিবেচনা করা হয়েছে। জিটিআই প্রতিটি দেশকে ০ থেকে ১০ পর্যন্ত স্কেলে স্কোর করে, যেখানে ০ সন্ত্রাসবাদের ওপর কোনো প্রভাব প্রকাশ করে না এবং ১০ সন্ত্রাসবাদের সর্বোচ্চ পরিমাপযোগ্য প্রভাব প্রতিফলিত করে। কম স্কোরসহ একটি উচ্চ স্তর সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্রে কম প্রভাব নির্দেশ করে। আফগানিস্তান ৮.৮২২ স্কোর পাওয়ায় সন্ত্রাসবাদের সর্বোচ্চ প্রভাবের দেশ হিসেবে তালিকার শীর্ষে রয়েছে।

জিটিআই রিপোর্টটি ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড পিস (আইইপি) দ্বারা সন্ত্রাস ট্র্যাকার এবং অন্যান্য উৎস থেকে ডেটা ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। টেররিজম ট্র্যাকার ২০০৭ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনাগুলোর রেকর্ড সরবরাহ করে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পাকিস্তান ৮.১৬, ভারত ৭.১৭৩ এবং নেপাল ৪.১৩৪ স্কোর পেয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, সন্ত্রাসবাদের প্রভাবের দিক থেকে নেপালের পরেই বাংলাদেশ দ্বিতীয় অগ্রগতি অর্জনকারী দেশ। উভয় দেশেই ২০২২ সালে দুটি হামলার ঘটনা রেকর্ড করেছে এবং কোনো মৃত্যু হয়নি।

দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে সবচেয়ে মন্দ জিটিআই স্কোর অর্জনকারী দশটি দেশের মধ্যে দুটি হচ্ছে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান। এই অঞ্চলের সাতটি দেশের মধ্যে, শুধু ভুটানের জিটিআই স্কোর শূন্য, অর্থাৎ গত পাঁচ বছরে কোনো সন্ত্রাসী হামলা রেকর্ড করা হয়নি।

প্রতিবেদন: জে আর পঙ্কজ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩রা সেপ্টেম্বর ২০২২ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট ও চট্টগ্রামের চা শ্রমিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তৃতা করেন –পিআইডি

চা শ্রমিকের উন্নয়নে চা শিল্পের উন্নয়ন

ইসরাত জাহান

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ। দেশের উন্নয়নে সরকারের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জাতীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেক বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল, তার মধ্যে অন্যতম ক্ষেত্র হলো 'শিল্প'। শিল্পোন্নত দেশ সবসময় উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলে। আর এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের 'চা' শিল্প খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য।

যে-কোনো শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখে সেখানে কর্মরত শ্রমিকরা। শ্রমিকরা সন্তুষ্ট থাকলে আমরা এখান থেকে আরও বেশি পরিমাণে চা উৎপাদন করতে পারি এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান বাড়াতে পারি সহজে। নানা সমস্যায় জর্জরিত থাকে চা শ্রমিকরা, তাই কাঙ্ক্ষিত চা উৎপাদন ব্যাহত হয়ে থাকে।

বলে রাখা দরকার, বাংলাদেশের প্রায় আড়াইশ চা বাগানে ১৫ লাখ চা শ্রমিক সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত আছে। তারা অতি দরিদ্র। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসাসহ নানান সুবিধা পর্যাপ্ত পরিমাণে তারা পায় না। চা বাগান এলাকাগুলোতে পড়ালেখার সুবিধা কম থাকায় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকরা তাদের বাচ্চাদের পড়ালেখা করাতে পেরে উঠছে না। এসব বাগানে বিদ্যালয় সংখ্যা অপ্রতুল, যোগাযোগ ব্যবস্থাও খুব একটা সহজ নয়। ভালোভাবে বেঁচে থাকতে হলে ভালো খাবারের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যসেবাও যথাযথ থাকতে হবে। এর পরে পড়ালেখা।

চা শিল্পে বঙ্গবন্ধুর অবদান

চা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান:	প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান:
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৪ঠা জুন ১৯৫৭ সাল থেকে ২৩শে অক্টোবর ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত প্রথম বাঙালি হিসেবে চা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত থেকে বাঙালি জাতিকে সম্মানিত করেন।	বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর 'বাংলাদেশ টি ইন্ডাস্ট্রিজ ম্যানেজমেন্ট কমিটি (BTIMC)' গঠন করে যুদ্ধোত্তর মালিকানাবিহীন/পরিত্যক্ত চা বাগান পুনর্বাসন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এছাড়াও যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিত্যক্ত বাগানগুলোকে বাগান মালিকদের নিকট পুনরায় হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।
বঙ্গবন্ধু চা বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাকালীন ১১১-১১৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকায় সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ০.৩৭১২ একর ভূমির ওপর চা বোর্ডের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত হয়।	তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত চা কারখানাগুলো পুনর্বাসনের জন্য 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া' থেকে ঋণ গ্রহণ করতঃ চা শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানির ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।
তিনি ১৯৫৭ সালে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে টি রিসার্চ স্টেশনের গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করে উচ্চ ফলনশীল জাতের (ক্লোন) চা গাছ উদ্ভাবনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	চা শিল্পের অস্তিত্ব রক্ষায় বঙ্গবন্ধুর সরকার চা উৎপাদনকারীদের নগদ ভর্তুকি প্রদান করার পাশাপাশি ভর্তুকি মূল্যে সার সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। উক্ত সার সরবরাহ কার্যক্রম এখনও অব্যাহত আছে।
চায়ের উচ্চফলন নিশ্চিত করতে সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চট্টগ্রামের কর্ণফুলি এবং শ্রীমঙ্গলস্থ ভাড়াউড়া চা বাগানে উচ্চফলনশীল জাতের চারা রোপণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।	তিনি চা শ্রমিকদের শ্রমকল্যাণ; যেমন– বিনামূল্যে বাসস্থান, সুপেয় পানি সরবরাহ, বেবি কেয়ার সেন্টার, প্রাথমিক শিক্ষা এবং রেশন প্রাপ্তি নিশ্চিত করেন।
তিনি 'টি অ্যাক্ট-১৯৫০' সংশোধনের মাধ্যমে চা বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ) চালু করেছিলেন, যা এখনও চালু রয়েছে।	তিনি ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ টি রিসার্চ স্টেশনকে পূর্ণাঙ্গ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটে উন্নীত করেন। বর্তমানে তা বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (BTRI) নামে পরিচিত।

সূত্র: বাংলাদেশ চা বোর্ড

শ্রমিকের মনে অসন্তোষ থাকলে চা উৎপাদনও কমে যায়। সে কারণে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২২ সালে মজুরি বাড়িয়ে ১৭০ টাকা করেন। একইসঙ্গে বাড়তি চা-পাতা তোলা, উৎসব বোনাসসহ শ্রমিকের আনুপাতিক হারে অন্যান্য ভাতা ও সুবিধা বাড়ানোর বিষয়ে পদক্ষেপ নিয়েছেন। তাদের অসুস্থতা ছুটিসহ ভর্তুকি মূল্যে রেশন সুবিধা বাড়ানো হয়েছে। চিকিৎসা সুবিধা, অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের পেনশন, তাদের পোষ্যদের শিক্ষা বাবদ ব্যয়, রক্ষণাবেক্ষণ, গোচারণভূমি চৌকিদারি বাবদ ব্যয়, বিনামূল্যে বসতবাড়ি ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ শ্রমিক কল্যাণ কর্মসূচি এবং বসতবাড়িতে উৎপাদন বাবদ আয় বাড়বে। সব মিলিয়ে ৪৫০ থেকে ৫০০ টাকার মতো পড়বে দৈনিক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যথেষ্ট উদার মনোভাব দেখিয়েছেন।

চা উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে নবম স্থানের অধিকারী। করোনার সময়েও উৎপাদন ভালো ছিল, অর্থনৈতিক উন্নয়ন চলমান রেখেছে এ শিল্প। তবে চা শ্রমিকরা দরিদ্র ও পশ্চাৎপদই না, তারা নানান ক্ষেত্রে এখনও অনেক পিছিয়ে। তাদের উন্নয়নে শ্রম আইন ও বিধিমালা যথাযথ কার্যকর করা প্রয়োজন। তাদের উন্নয়নে কেবল মজুরি বৃদ্ধিতে সীমাবদ্ধ করা যাবে না, তাদের বাঁচিয়ে রাখতে

হলে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি পূর্ণ মর্যাদা দিতে হবে।

চা জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সংবেদনশীল বিষয়গুলোতে আমাদের পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে, তাদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে হবে যাতে করে সমস্যাগুলো মূল জায়গা থেকে চিহ্নিত করা সম্ভব। চা জনগোষ্ঠী মূলধারার জনগোষ্ঠী থেকে অনেকটা পিছিয়ে, সমস্যা বহুমাত্রিক। তাদেরকে বাদ দিয়ে আমরা টেকসই উন্নয়নে এগোতে পারব না। লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব নয়।

চা শ্রমিকদের অনেক অভিমান আছে, তারা প্রায় ৭০ বছর চা বাগানে জঙ্গল কেটে বসবাস করলেও ভূমির ওপর কোনো অধিকার নেই। পর্যাপ্ত শৌচাগার নেই, এখানে ৫২ শতাংশই দরিদ্র, গর্ভকালীন ছুটি পর্যন্ত অবহেলিত।

চা শ্রমিকদের জীবনমানে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে পারলে এ শিল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, প্রয়োজন সুদৃষ্টির।

ইসরাত জাহান: সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ

সংসদে বঙ্গবন্ধু ও মুজিববর্ষ বিশেষ অধিবেশন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

জাতীয় সংসদের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে *সংসদে বঙ্গবন্ধু ও মুজিববর্ষ বিশেষ অধিবেশন* শীর্ষক দুটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৬ই এপ্রিল সংসদের বিশেষ অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে একাদশ জাতীয় সংসদের কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বই দুটির মোড়ক উন্মোচন করেন। সংসদ সচিবালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয়ের পর ক্ষমতা না দেওয়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে মহান স্বাধীনতা অর্জিত হয়। স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই বঙ্গবন্ধু জাতিকে উপহার দেন সংবিধান। এরপর ৭ই মার্চ ১৯৭৩ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান– এটা বিশ্বে বিরল। কমিটির সভাপতি জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

প্রতিবেদন: শুভ আহমেদ

মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ দেওয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য

মুজিবনগর সরকারের পটভূমি

কে সি বি তপু

বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় অধ্যায় হলো ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বা মুজিবনগর সরকার কিংবা প্রবাসী সরকারের নেতৃত্বেই আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। ১৭ই এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস একটি অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা ও ছক অনুসারেই মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক করা হয়। তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এএইচএম কামারুজ্জামান এবং ক্যাপটেন এম মনসুর আলী– এই জাতীয় চার নেতা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৯৭১ সালের ছাব্বিশে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ার পর পাকিস্তানি সৈন্যরা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে যায়। তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বের বিষয়টি মূলত এই জাতীয় চার নেতার ওপর বর্তায়। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁদের গভীর সম্পর্কের কারণে সরকার গঠন, পরিচালনা ও মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশনার ইঙ্গিত পূর্বেই বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর আর্থসামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনা থেকে বাঙালিদের মুক্তির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিদের দাবি আদায়ে অবিচল থাকায় তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়। কিন্তু এতে তিনি দমে যাননি বরং জেল-জুলুম এমনকি প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ করতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন নানারকম রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে। বাঙালির মুক্তির লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভেবেচিন্তেই সময়োচিত সিদ্ধান্ত নিতেন বঙ্গবন্ধু। স্বাধীনতার পথে তাঁর সেই সময়োপযোগী চিন্তার ফসলই ছিল ঐতিহাসিক ছয় দফা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে স্বায়ত্তশাসন দাবি আদায়ে ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচিতে অভূতপূর্ব গণজাগরণ সৃষ্টি করেন। ছয় দফা কর্মসূচির আপাত লক্ষ্য স্বায়ত্তশাসন অর্জন কিন্তু সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য মুক্তি অর্জন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী লীগ নেতারা সারা বাংলায় এই ছয় দফাকে বাঙালির বাঁচার দাবি হিসেবে অভিহিত করে প্রচার করেন। এই ছয় দফা দেশে অসামান্য গণজাগরণ সৃষ্টি করে।

সরকার ছয় দফার জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে ১৯৬৬ সালের ৮ই মে শেখ মুজিবুর রহমানকে আটক করে দেশরক্ষা আইনে। আওয়ামী লীগের অন্যান্য প্রধান নেতাদেরও আটক করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানসহ নেতাদের মুক্তির দাবিতে ৭ই জুন পূর্ব পাকিস্তানে পালিত হয় সর্বাত্মক ধর্মঘট। শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যদের বিরুদ্ধে আনা হয় দেশদ্রোহের অভিযোগ। দায়ের করা হয় রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য মামলা যা সাধারণভাবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত। ১৯৬৮ সালের জুন মাসে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে মামলার বিচার শুরু হলে দানা বাঁধতে শুরু করে আইয়ুববিরোধী দুর্বার গণ-আন্দোলন। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে সে আন্দোলন পরিণত হলো অপ্রতিরোধ্য গণ-অভ্যুত্থানে; অবশেষে ২২শে ফেব্রুয়ারি মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল বন্দিদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয় সরকার।

১৯৫৮ সালে ক্ষমতা দখলের পর সামরিক শাসক আইয়ুব খান পাকিস্তানে কোনো সাধারণ নির্বাচন দেননি। তিনি ১৯৬৯ সালে গণ-অভ্যুত্থানের মুখে আর একজন সামরিক ব্যক্তি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা অর্পণ করে বিদায় নেন। ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, তিনি দ্রুতই সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবেন। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ব্যারাকে ফিরবেন।

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের ২৮শে নভেম্বর সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ১৯৭০ সালের ৫ই অক্টোবর ঘোষণা করেন। সর্বজনীন ভোটাধিকার ও জাতীয় পরিষদে জনসংখ্যাভিত্তিক আসন স্বীকৃত হয়। ১৯৭০ সালের ৩০শে মার্চ ঘোষিত লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচনকে স্বাগত জানানো হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের ভিত্তি বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচি। ছয় দফা দাবি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জাতি একাত্ম হয়ে যায়। আওয়ামী লীগের প্রতি এদেশের জনগণ তাদের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে। বিপুল ভোটের ব্যবধানে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে আওয়ামী লীগ বিজয় লাভ করে।

সামরিক শাসন এবং পাকিস্তানি সামরিক জান্তার গণতন্ত্রবিরোধী অপশাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলনের পথ বেয়ে আসে ঐ নির্বাচন। আইয়ুববিরোধী আন্দোলন ছিল গণতন্ত্র উদ্ধারের আন্দোলন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের আবেগ সত্ত্বায় ধারণ করে স্বাধিকারের চেতনায় জেগে উঠেছিল। বঙ্গবন্ধু তখন বাঙালির একক নেতার আসন লাভ করেন। জনগণ তাঁকে মুক্তির দিশারি হিসেবে গ্রহণ করে। এরই প্রতিফলন ঘটে এই নির্বাচনে। নিরঙ্কুশভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে বিজয়ী হয় আওয়ামী লীগ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩রা জানুয়ারি ১৯৭১ সালে রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের এমএনএ এবং এমপিএদের ছয় দফার ভিত্তিতে বাঙালির অধিকার আদায়ে শপথ পড়ান। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন করতে না দিয়ে প্রহসন শুরু করলে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীনতার পক্ষে আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ বঙ্গবন্ধু অসীম সাহসের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। তিনি ছয় দফাকে এক দফায় পরিণত করেন। তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির মহান বীরপুরুষ। তিনি বীর বাঙালির প্রতীকে পরিণত হন। সম্মোহনী শক্তির অধিকারী বাংলার জনপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে ছিল ঐন্দ্রজালিক মহাশক্তি। তিনি রাজনীতির মহান কবি, যাঁর ভাষণ শুধু চিত্তাকর্ষক নয়, কাব্যিক-ব্যঞ্জনাময়ও। তাঁর ভাষণ এবং এসব আন্দোলনে ধ্বনিত– আমি কি তুমি কি, বাঙালি বাঙালি; তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা; বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর ইত্যাদি স্লোগান এবং জাতীয় পতাকা তৈরি ও উত্তোলন ইত্যাদি ঘটনাপ্রবাহ বাঙালিকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে বীর বাঙালিতে পরিণত করে। ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে মুক্তিযুদ্ধের ডাক দেওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানি শাসকদের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখা, সর্বোপরি ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর অপারেশন সার্চলাইট শীর্ষক বর্বর আক্রমণের পর গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়াতেও ছিল তাঁর দূরদর্শিতা। তদুপরি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে বাংলাদেশের সরকার গঠন এবং এ সরকার পরিচালিত স্বাধীনতা যুদ্ধ পেয়েছে বৈশ্বিক ও আইনগত বৈধতা। এতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সহানুভূতি ও সমর্থন আদায় সহজতর হয়েছিল।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক মো. জাকির হোসেনের ভাষায়–

> ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করা হয় ৩রা মার্চ। এই অধিবেশনে উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সংবিধানের একটি খসড়া রচনা করা হয়। খসড়া সংবিধান দলীয় অনুমোদনের জন্য ১লা মার্চ পূর্বাণী হোটেলে পার্লামেন্টারি পার্টির একটি অধিবেশন ডাকা হয়। আওয়ামী লীগ দলীয় পার্লামেন্টারি পার্টির ঐ অধিবেশন শুরুর আগে গণপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কোনোরূপ আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ ছাড়া ৩রা মার্চে অনুষ্ঠেয় গণপরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা। এমন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ঐকমত্যের ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সব ক্ষমতা অর্পণ করেন। তিনি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন সেটাই হবে বাংলাদেশ গণপরিষদের সিদ্ধান্ত।
>
> বঙ্গবন্ধু দলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও চার সহসভাপতিকে নিয়ে পাকিস্তান জান্তা সরকারের সমান্তরাল একটি অনানুষ্ঠানিক সরকার গড়ে তোলেন, যা সেই সময় 'হাইকমান্ড' নামে পরিচিত ছিল। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সব প্রশাসন এই হাইকমান্ডের নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছিল। (মো. জাকির হোসেন, 'মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের জন্মসনদ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র', *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ১০ই এপ্রিল ২০২৩)

মুক্তিযুদ্ধকালে রাষ্ট্র গঠনের আবশ্যিক উপাদান একটি আনুষ্ঠানিক সরকারের প্রয়োজনীয়তা আইন ও বাস্তবতার নিরিখে ব্যাপকভাবে অনুভূত হতে থাকে। সেই লক্ষ্যেই গঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার, যা মুজিবনগর সরকার নামেই সমাধিক পরিচিত। মুজিবনগর সরকার অন্য প্রবাসী সরকার থেকে ভিন্ন। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল জাতীয় নির্বাচনে নির্বাচিত ১৬৭ জন এমএনএ এবং ২৯৩ এমপিএ একটি স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করেন। তাঁদের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। শুধু নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকার গঠন ইতিহাসে বিরল। এই সরকার ১৯৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের (এমএনএ ও এমপিএ) সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। সুতরাং এই সরকার ছিল সম্পূর্ণ সাংবিধানিক, প্রতিনিধিত্বশীল ও বৈধ।

ঐ দিনই অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান তথা বাংলাদেশের 'জন্মসনদ' স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রও প্রণয়ন করা হয়। এ সরকারের ঘোষণাপত্রে ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করা হয়। বিশ্বে যে কয়টি দেশ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র দিয়ে যুদ্ধ করেছে বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। প্রবাসী সরকার গঠিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধে প্রবল গতি সঞ্চার হয়। নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করে বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম।

মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল গঠিত বাংলাদেশ সরকার ১৭ই এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের অন্যতম মুক্তাঞ্চল কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর মহকুমার আমবাগান ঘেরা বৈদ্যনাথতলা গ্রামে শপথ গ্রহণ করে। এই অঞ্চল ছিল স্বাধীন এবং এর নতুন নাম হয় মুজিবনগর। আরও উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নজির দ্বিতীয়টি নেই যে, এ ধরনের সরকার দেশের স্বাধীন ভূমিতে শপথ গ্রহণ করেছে। সাংবিধানিকভাবে মুজিবনগরই ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী। অবশ্য নিরাপত্তার কারণে রাজধানীর সদর দপ্তর ছিল কলকাতায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে স্থানটির নামকরণ হয় 'মুজিবনগর' এবং সেখানে শপথ অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে বাংলাদেশের সরকার 'মুজিবনগর সরকার' নামে পরিচিতি

মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সে ঐতিহাসিক ১৬ই ডিসেম্বরে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের ভাস্কর্য

লাভ করে। মুজিবনগর সরকারের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশ ভূখণ্ডের বাইরে থেকে পরিচালিত হয়েছিল বলে এ সরকার 'প্রবাসী সরকার' হিসেবেও খ্যাত। এ সরকারের রাষ্ট্রপতি হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তবে তিনি পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকায় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন তাজউদ্দীন আহমদ। তাঁর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন ক্যাপটেন এম মনসুর আলী, এএইচএম কামারুজ্জামান প্রমুখ।

আওয়ামী লীগ নেতা, সংসদ সদস্য ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, সভাপতি এবং বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ তোফায়েল আহমেদ লিখেন–

> পঁচিশে মার্চ দিনটির কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। এদিন মনি ভাই এবং আমি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিই। বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি বুকে টেনে আদর করে বলেছিলেন, 'ভালো থেকো। আমার দেশ স্বাধীন হবেই। তোমাদের যে নির্দেশ দিয়েছি, তা যথাযথ ভাবে পালন কোরো।' ... বঙ্গবন্ধু আমাদের জন্য আগেই বাসস্থান নির্ধারণ করে রেখেছেন। ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে ভুট্টো যখন টালবাহানা শুরু করে তখন ১৯৭১-এর ১৮ই ফেব্রুয়ারি ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাসভবনে জাতির জনক জাতীয় চার নেতার সামনে আমাদের এই ঠিকানা মুখস্থ করিয়েছিলেন, 'সানি ভিলা, ২১ নম্বর রাজেন্দ্র রোড, নর্দার্ন পার্ক, ভবানীপুর, কলকাতা।' বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'এখানে তোমরা থাকবে। তোমাদের জন্য সব ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি।' (তোফায়েল আহমেদ, 'মুজিবনগরে স্বাধীনতার সূর্যোদয়', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ই এপ্রিল ২০২৩)

বঙ্গবন্ধু শুধু মুজিবনগর সরকারের আইনানুগ ও বৈধ পটভূমিই তৈরি করেননি, এর ভিত্তিভূমিও রচনা করেন তিনিই। তিনি এ সরকারের কর্মকাণ্ডের মূলেও সঞ্চারণশীল ছিলেন ফল্গুধারার মতো। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত নিয়মতান্ত্রিক বৈধ সরকার হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদান মুজিবনগর সরকারের অনন্য চিরস্মরণীয় বৈশিষ্ট্য। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিকভাবেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার নেতৃত্ব প্রদানে কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দল বা সংস্থার নয়, বরং জনগণের নির্বাচিত সরকারের কার্যকারিতা সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর সরকার তার প্রতিটি কার্যক্রম বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় এবং বঙ্গবন্ধুর নামে পরিচালনা করেছে। মুজিবনগর সরকার শুধু স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারই নয়, সফল সরকারও বটে। একটি স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে জাতীয়-আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টি ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় এবং বাংলাদেশের জনগণকে তাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে অদম্য স্পৃহায় মরণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়। এই সরকার গঠনের ফলে বিশ্বজুড়ে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামরত বাঙালিদের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত হয়। মুজিবনগর শুধু ঐতিহাসিক স্থানই নয়, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং রাষ্ট্র গঠনের ভূমিও। সর্বোপরি, নয় মাস যুদ্ধের পর এই মুজিবনগর সরকারের হাত ধরেই ১৬ই ডিসেম্বর অর্জিত হয় চূড়ান্ত বিজয়। এ সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের অবদান অবিস্মরণীয়। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর জাতীয় চার নেতা– সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামানের অসামান্য অবদান সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি এবং তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

কে সি বি তপু: কবি, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক ও গবেষক, kcbtopu@gmail.com

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সুবর্ণ জয়ন্তী

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৭ই এপ্রিল ২০২৩ জাতীয় সংসদ ভবনে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ৫০ বছরপূর্তিতে 'সুবর্ণ জয়ন্তী' উপলক্ষে জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ দেন –পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই এপ্রিল ২০২৩ জাতীয় সংসদের ৫০ বছরপূর্তি উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশনে প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম ও সিলমোহর অবমুক্ত করেন –পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই এপ্রিল ২০২৩ জাতীয় সংসদের ৫০ বছরপূর্তি উপলক্ষে জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন –পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই এপ্রিল ২০২৩ জাতীয় সংসদের ৫০ বছরপূর্তি উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশনে প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম ও সিলমোহর অবমুক্ত করেন –পিআইডি

বৈশাখি মেলা

ঐতিহ্য ও সম্প্রীতির প্রতীক

শামসুজ্জামান শামস

বাঙালির জীবনে ঐতিহ্যের রং আর রূপ নিয়ে আসে পহেলা বৈশাখ। গোটা দেশ এদিন মেতে ওঠে উৎসব আয়োজনে। আবহমান বাংলার হাজার বছরের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় বাঙালি বরণ করে নতুন বছরকে। শুধুই কি বাঙালি? বাংলা ভাষাভাষী আদিবাসী ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের জীবন-জগতে স্বপ্নময় নতুন বছরের শুভযাত্রা সূচিত হয় এই বৈশাখে। বৈশাখের প্রথম দিবসটি আবহমানকাল থেকেই আমাদের সত্তায়, চেতনায় ও অনুভবের জগতে এক গভীরতর মধুর সম্পর্ক নিয়ে বিরাজ করছে। পহেলা বৈশাখ পুরনো জরাজীর্ণকে ঝেড়ে ফেলে আমাদের যাপিত জীবনে নতুন সম্ভাবনা ও নতুন প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলতেই শুধু নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে একাকার হওয়ার প্রেরণাও জোগায়। তাই পহেলা বৈশাখই হচ্ছে বাঙালির জীবনে সবচেয়ে বড়ো অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন উৎসব। বাংলা ও বাঙালির লোকজ সংস্কৃতির মূল বিষয়টি হলো, উৎসবের মধ্য দিয়ে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। সেই উৎসবের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, কৃষ্টি ও গৌরব। বিগত বছরের সব অপূর্ণতা, গ্লানি, ব্যর্থতা মুছে ফেলে জীবনকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার আশায় বাঙালি উদ্‌যাপন করে তার একান্ত আপন নতুন বর্ষ।

পহেলা বৈশাখ ও বৈশাখি মেলা ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে বাঙালির প্রাণের উৎসব ও প্রাণের মেলা হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন। বাঙালির কৃষ্টিকালচার আর ঐতিহ্য নিয়ে বর্ণিল সাজে মঙ্গল শোভাযাত্রা, হালখাতা ও গ্রামে গ্রামে বৈশাখি মেলা আয়োজনের মাধ্যমে চলে বর্ষবরণ। বাঙালির জীবনে পহেলা বৈশাখ আসে অন্যরকম স্বপ্ন আর অমিত সম্ভাবনার ফুলঝুড়ি নিয়ে। জরা ও জীর্ণ, দীনতা ও নীচতাকে পদতলে পিষ্ট করে সুন্দরের পথে অবিরাম হাঁটার ও শুদ্ধ সংস্কৃতি চর্চার অঙ্গীকারের দিন বৈশাখ। কয়েকশো বছর ধরে জীবনের নানা অনুষঙ্গকে ধারণ করে এ দিনটি বাঙালিরা উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে উদ্‌যাপন করে আসছে। নতুন দিনের কেতন ওড়ানো পহেলা বৈশাখের গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন হালখাতা ও বৈশাখি মেলা। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আকবর বাদশার দরবার থেকে বাংলা সনের উদ্ভবের পরপরই বৈশাখের প্রথম দিনকে উদ্‌যাপন করে আসছে কৃষক ও মেহনতি মানুষেরা। বৈশাখ উদ্‌যাপনের অনুষঙ্গ হিসেবে পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছিল বৈশাখি মেলা। দল-মত-বর্ণনির্বিশেষে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনে সর্বজনীন উৎসবের যে রূপ বৈশাখি মেলা সেই রূপকে ব্যপ্ত ও পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করে। শুরুর দিক থেকেই বৈশাখি মেলা ছিল বৈশাখ উদ্‌যাপনের প্রধান মাধ্যম।

পহেলা বৈশাখের আগের দিন অর্থাৎ চৈত্রের শেষ দিনে পালিত হয় চৈত্রসংক্রান্তি, বসে বারোয়ারি মেলা। শহরের মেলায় পান্তাভাত ও ইলিশ খাওয়ার রেওয়াজ চালু হয়েছে। তবে গ্রামবাংলায় মানুষ আর্থিক অনটনের কারণে ইলিশের নাগাল না পেয়ে পেঁয়াজ-মরিচ দিয়ে পান্তা খেয়ে নববর্ষের সূচনা করে থাকে।

গ্রামে একসময় ভেষজ রস, নাড়ু, মোয়া, মুড়ালি, খাজা, চিড়া, দই, গুড়, বাতাসা ইত্যাদি খাবার খেয়ে দিনের সূচনা করা হতো। কোথাও কোথাও এখনো আয়োজন হয় নানা ধরনের খেলাধুলার। বাজানো হয় ঢোলকসহ নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র। এই দিনে আনন্দ করে শিশু-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ সবাই।

বাংলা নববর্ষে আমাদের গ্রামবাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির অংশ

বৈশাখি মেলা যুগ যুগ ধরে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে চলেছে। মেলা বাঙালি সংস্কৃতি ও কৃষ্টির অপরিহার্য অঙ্গ। আমাদের জীবনের সঙ্গে মেলার যোগ দীর্ঘকালের। উৎসব, বিনোদন, বিকিকিনি আর সামাজিক মেলামেশার উদার ক্ষেত্র হচ্ছে মেলা। বাংলাদেশে বিভিন্ন পার্বণে মেলা হয়ে থাকে। নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত বৈশাখি মেলা বাঙালির চেতনাকে উজ্জীবিত করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে মেলা হয়ে থাকে। দীর্ঘকাল ধরেই মেলার প্রবর্তন লক্ষ করা যায়। এজন্য বলা হয় বাংলাদেশ একটি মেলাময় দেশ। সারা বছরই কোনো না কোনো স্থানে মেলা বসে ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষকে কেন্দ্র করে। আগে মেলার প্রায় সর্বাংশই ছিল গ্রামকেন্দ্রিক, যুগের পরিবর্তনে ধীরে ধীরে সেই চিত্র পালটে গিয়ে বর্তমানে গ্রাম ও শহর উভয় স্থানেই ছড়িয়ে পড়েছে। কবে থেকে এবং কীভাবে এ দেশে মেলার উৎপত্তি হয়েছে তা সঠিক করে বলার উপায় নেই। গবেষকদের ধারণা, বাংলায় নানা ধরনের ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠান ও উৎসবের সূত্র ধরেই মেলার উৎপত্তি হয়েছে। সেদিক দিয়ে বাংলাদেশের মেলার প্রাচীনত্ব হাজার বছরেরও অধিক পুরোনো। পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন করা হয় জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে। এ দিনটির সঙ্গে অন্য যে বিষয়টি নিবিড়ভাবে জড়িত তা হলো মেলা। মেলায় শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীসহ পরিণত মানুষের বিশাল সমাবেশ ঘটে। শিশুরা বাবা-মার হাত ধরে কিংবা কোলে বা কাঁধে চড়ে মেলায় এসে নির্মল আনন্দ লাভ করে। বৈশাখি মেলা সাধারণত দুদিনব্যাপী হয়ে থাকে, কোথাও কোথাও এর স্থায়িত্ব আরও বেশিও হয়ে থাকে। চৈত্র মাসের শেষ দিনে চৈত্রসংক্রান্তির মেলা।

আগে দু-তিন গ্রামের সীমান্তবর্তী স্থানে অথবা নদীর ধারে, বটতলায় বৈশাখি মেলার আয়োজন করা হতো। এসব মেলায় নামতো হাজার হাজার মানুষের ঢল। মেলায় থাকত কাঁচের চুড়ি, রং-বেরঙের ফিতা, তাঁতের শাড়ি, নকশা করা হাতপাখা, কামার ও কুমোরের দোকান, মুড়ি-মুড়কি-খই, সন্দেশ, বাতাসা, মিষ্টি, মাটির তৈরি খেলনা, পুতুল, ঘুড়ি, নাটাই, গুলতি, অলংকার, তৈজসপত্র, বেলুন, বাঁশি, ফলমূল ইত্যাদি। আর বিনোদনের জন্যে থাকত নাগরদোলা, বায়োস্কোপ, জারি-সারি-ভাটিয়ালি গানের আসর, কবিগান, ষাড়ের লড়াই, লাঠিখেলা, পুতুল নাচ, নৌকা বাইচ, কুস্তি খেলা ইত্যাদি। কোথাও কোথাও বসতো জুয়ার আসরও! বৈশাখি মেলায় শিশু-কিশোরদের প্রধান আকর্ষণ ছিল নাগরদোলা ও বায়োস্কোপ। নাগরদোলার প্রচলন এখনো টিকে থাকলেও বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বায়োস্কোপকে এখন আর দেখা যায় না।

গ্রামীণ লোকজ মেলার আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে মেলবন্ধ। এটি এই মেলার একটি বড়ো দিক। সারা বছর যেসব আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সাথে দেখা হতো না, বৈশাখি মেলা উপলক্ষে তাদের সাথে দেখা হতো। অনেকে পুরো একটি বছর অপেক্ষায় থাকত মেলা উপলক্ষে বেড়াতে আসার জন্য। সারা বছর অবসর না পেলেও মেলা উপলক্ষে ঠিকই অবসর করে নিত। মেয়েরা সারা বছর বাবার বাড়ি না এলেও মেলা উপলক্ষে এক-দুদিন আগেই চলে আসত। মা-বাবা, নানা-নানি, দাদা-দাদি সব আত্মীয়স্বজনের সাথে দেখা হতো। এ যে কত বড়ো প্রাপ্তি আর আনন্দের বিষয় তা বলে শেষ করা যাবে না। মেলায় যাওয়া বড়ো উদ্দেশ্য নয়, একে অপরের সাথে দেখা করাটা ছিল তাদের মধ্যে বড়ো বিষয়। এলাকার অনেক বড়ো ভাই বা ছোটোবেলার বন্ধুরা হয়ত কাজের সূত্রে দূরে কোথাও থাকে। সারা বছর দেখা না হলেও বৈশাখি মেলা উপলক্ষে বাড়ি আসে এবং সবার সাথে দেখা হয়। একে অপরের খোঁজখবর নেয়, কত কথা, কত আনন্দ, বেদনা, সংসারের কত গল্প যে এই মেলার ভিড়ে মিশে যায়! এমন অনেক স্বজন আছেন যারা সারা বছর কোনো দিনই আসেনি, কিন্তু বৈশাখি মেলাকে কেন্দ্র করে আত্মীয়র বাড়িতে আসে। স্বজনে স্বজনে অনেক গল্প হয়, অনেক স্মৃতি জড়িয়ে থাকে মেলাকে কেন্দ্র করে। সারা রাত জেগে একে অপরের সাথে সুখ-দুঃখের গল্প করে, হাসি-ঠাট্টায় মেতে থাকে। প্রতিবছরের মেলায় জড়িয়ে থাকে কতই না মধুর স্মৃতি।

বৈশাখি মেলাকে কেন্দ্র করে দোকান বসে বাহারি পণ্যের পসরা নিয়ে, বেলা বাড়ার সাথে সাথে সরব হয়ে ওঠে বেচাকেনা। সারা বছর ধরে গ্রামের বৌ-ঝিরা অল্প অল্প করে টাকা জমায় মেলায় খরচ করার জন্য। তারা মেলা থেকে সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কিনেন। সারা বছর কাজে লাগে এমন কিছু জিনিস তারা কেনেন। এগুলো নিজেদের পছন্দের আবার সংসারের প্রয়োজনীয়। সারা বছর সহজে তারা পণ্য কেনেন না। মেলা উপলক্ষে মেলা থেকে তারা এসব জিনিস কেনেন। নিজেরা যান না কিন্তু ছেলে, ভাতিজা, ভাইদের দিয়ে এসব পণ্য কিনিয়ে নেন।

গ্রামের মানুষেরা নতুন দিনের আনন্দে বৈশাখি মেলায় কেনাকাটা করতে যেত। নারীদের জন্যও বৈশাখি মেলা ছিল আনন্দের। বৈশাখি মেলা থেকে গৃহকর্তারা তাদের জন্যে শাড়ি, চুড়ি, ফিতা কিনে আনতেন। নতুন খেলনা পেত শিশুরা। আবার কুটিরশিল্পের সঙ্গে জড়িত মানুষদের জন্যও এ মেলা ছিল প্রাণের মেলা। যদিও এর সঙ্গে তাদের জীবন ও জীবিকার তাগিদ তীব্র

ছিল। তাদের হাতের তৈরি তৈজসপত্র বিক্রির উৎসবক্ষেত্রও বৈশাখি মেলা। বর্তমানে এ ব্যবস্থা আরও বিস্তৃত হয়েছে। তাই বৈশাখি মেলা এখন কেবল ঐতিহ্যের মেলাই নয়, এটি এখন অর্থনীতি গতিপথের বিশিষ্ট মাত্রাও বটে। বৈশাখি মেলার মধ্য দিয়ে তাঁতি, কামার, কুমোর, ছুতার, হস্ত, কুটিরশিল্পীরা অর্থনৈতিক আলোর মুখ দেখে। তাই এ শ্রেণির মানুষদের জন্যও যে বৈশাখি মেলা তাৎপর্যবহ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মেলায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পজাত হরেক রকম পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রি ছাড়াও আগতদের মনোরঞ্জনের জন্য নানা ব্যবস্থা করা হয়। অতীতে মেলা উপলক্ষে আয়োজন করা হতো কবিগান, জারিগান, পালাগান, বাউলগান, পুতুল নাচ, যাত্রা, গাজীর পটসহ অন্যান্য গান। বিনোদনের জন্য আরও থাকত বায়োস্কোপ, নাগরদোলা, কুস্তি, কাবাডি, ঘুড়ি ওড়ানো ও ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতা, ষাঁড়ের লড়াই ও মোরগের লড়াই। এর সবকিছু না হোক কোনো কোনোটি এখনও টিকে আছে। মেলা উপলক্ষে যেসব খাবার, খেলনা ও কারুপণ্য তৈরি হয় তা আমাদের কৃষ্টির অন্যতম উপাদান। অতীতে বিভিন্ন স্থানে বৈশাখি মেলায় কাঠের আসবাবপত্র, কৃষিপণ্য, কৃষি উপকরণ, বীজ পাওয়া যেত। এখন এগুলো তেমন দেখা যায় না। মৃৎ ও কুটির শিল্পজাত বিভিন্ন পণ্যে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। অনেক ক্ষেত্রে মেলা আয়োজনেও এসেছে নতুনত্ব।

আগের অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটলেও মেলা এখনও জমজমাট। সর্বস্তরের সব বয়সের মানুষের কাছে মেলা অনাবিল আনন্দের উৎস হিসেবে চিহ্নিত। মেলার মাধ্যমে স্থানীয় সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সামাজিক অবস্থার পরিচয় মেলে।

গবেষকদের পরিসংখ্যান মতে, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম-শহরজুড়ে প্রতিবছর এখনো পাঁচ হাজারের অধিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে প্রচলিত প্রতিটি মেলা আয়োজনের পেছনে কোনো না কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। সেটি হয় ধর্মীয়, নয়তো ব্রত-পালা-পার্বণ অথবা যে-কোনো একটি নির্ধারিত বিষয় বা ঐতিহ্যকে স্মরণ করে। মেলার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে নির্ধারিত স্থানে নির্ধারিত তারিখ বা তিথি-লগ্নে একেকটি মেলায় নর-নারী, শিশু-কিশোর, এমনকি আবাল-বৃদ্ধরাও সমাগম ও সমাবেশ করে থাকে।

মেলার স্থান নির্বাচনে প্রাধান্য পায় নদীর তীর, গ্রামের বট পাকুড়াশ্রিত চত্বর কিংবা খেলার মাঠ, মঠ-মন্দির সংলগ্ন প্রাঙ্গণ, সাধু-সন্ত-ফকির-দরবেশের সাধনপীঠ বা মাজার, প্রসিদ্ধ পুণ্যস্থান বা তীর্থক্ষেত্র। আবার কখনও স্কুল-কলেজের চত্বর বা খেলার মাঠেও মেলা বসে।

গ্রামীণ সমাজ থেকে বৈশাখি মেলা শুরু হলেও বর্তমানে বৈশাখি মেলার উপকরণ ও উদ্‌যাপনে ভিন্নতা এসেছে। নাগরিক জীবন পহেলা বৈশাখে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। দিন দিন শহুরে বৈশাখি মেলার প্রচলন ও জনপ্রিয়তা বাড়ছে। শহুরে মানুষের ব্যস্ততা ও ক্লান্তির ফাঁকে একটুখানি আনন্দ পাওয়ার সুযোগ এনে দেয় এই মেলা। শহুরে বৈশাখি মেলায় তাই খেলনা, চুড়ি, বাঁশি, বেলুন– সব পাওয়া গেলেও শাকসবজি পাওয়া যায় না। এই মেলা শুধুই আনন্দের স্থান, ক্লান্তি কাটিয়ে নিজেকে চাঙা করে তোলার স্থান। তবে শহুরে বৈশাখি মেলা মূল বৈশাখি মেলার চেয়ে অন্য রকম হলেও এটি শহুরে মানুষদের বাঙালির ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী হস্ত ও কারুশিল্পকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে বৈশাখি মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উপযুক্ত পরিচর্যায় আন্তর্জাতিক বাজারেও এসব কারুশিল্প উল্লেখযোগ্য স্থান করে নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ থেকে এখন বছরে প্রায় ৯০ লাখ মার্কিন ডলার মূল্যের হস্তশিল্প সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, এরচেয়ে আরও অনেক বেশি পরিমাণ হস্তশিল্প পণ্য বিদেশে রপ্তানির সুযোগ বাংলাদেশের রয়েছে, যা আমরা কাজে লাগাতে পারছি না। দেশের সর্বত্র আরও বেশি সংখ্যায় বৈশাখি মেলা আয়োজন সে সুযোগকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সহায়ক হতে পারে। বাংলাদেশের আনাচকানাচে যে লাখ লাখ হস্ত ও কারুশিল্পী রয়েছেন, যারা বস্তুত তৃণমূল পর্যায়ের মানুষ এবং কোনো ধরনের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ ছাড়াই যারা উত্তরাধিকারসূত্রে এসব পেশার সঙ্গে জড়িত, বৈশাখি মেলা তাদের জন্য এক অমিত সম্ভাবনার ক্ষেত্র। বর্তমানে এই কারুশিল্পীরা নিজেদের চেষ্টা ও উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন বৈশাখি মেলায় অংশ নিলেও সেখানে তারা অনেকটাই প্রান্তিক পর্যায়ের অংশগ্রহণকারী। ঢাকায় বিসিক আয়োজিত বৈশাখি মেলাতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কারুশিল্পীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া হয়। এ সুযোগ দেশের সর্বত্র বিস্তৃত করা প্রয়োজন।

শামসুজ্জামান শামস: কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক

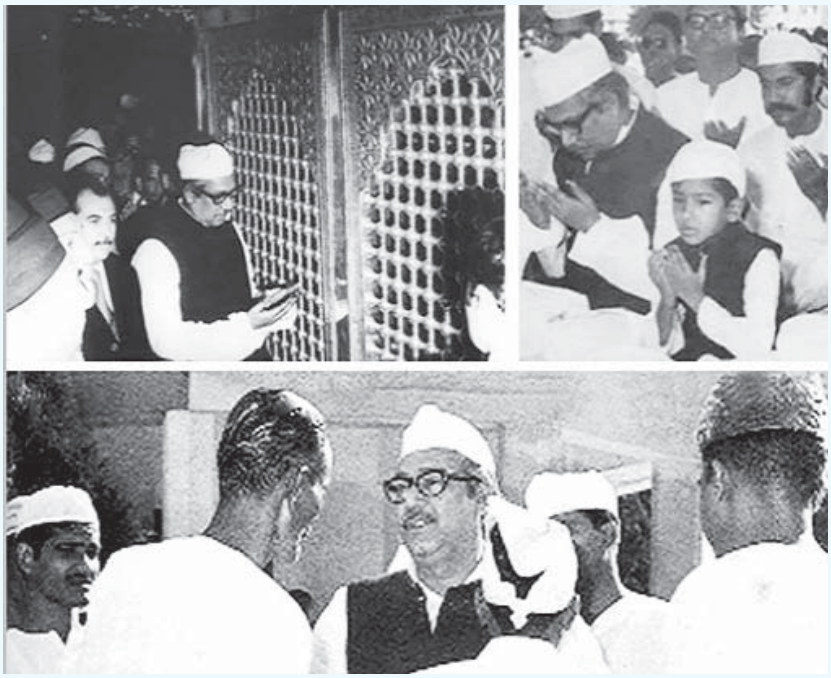

যেমন ছিল বঙ্গবন্ধুর ঈদ

আজহার মাহমুদ

বঙ্গবন্ধু যেমন মহান, তেমনি ছিলেন দয়ালু। বাংলার মানুষের জন্য এবং এই সোনার বাংলার জন্য তাঁর ত্যাগ ছিল অবিস্মরণীয়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন আর দশজন সাধারণ মানুষের মতো ছিল না। তাই অন্য সবার মতো তিনি ঈদ উদ্‌যাপন করতে পারেননি। কারণ জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি কারাগারে অতিবাহিত করেছেন। তাঁর জীবনের দীর্ঘদিন কেটেছে কারাগারে। ফলে বঙ্গবন্ধুর অনেক ঈদ কেটেছে জেলের ভেতর। পরিবার-পরিজন নিয়ে ঈদ করার সুযোগ তিনি কমই পেয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৭ সালে জেলে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা পালন করেন। *কারাগারের রোজনামচা* গ্রন্থে তিনি লিখেছেন তাঁর সেই কারাগারের ঈদ নিয়ে। তিনি কারাগারে বসে বসে ভাবতেন, 'পূর্ব বাংলার লোক সেইদিনই ঈদের আনন্দ ভোগ করতে পারবে, যেদিন তারা দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে এবং দেশের সত্যিকার নাগরিক হতে পারবে।' কারণ তিনি ঠিকই জানতেন, পরাধীন জাতি কখনও ঈদের আনন্দ করতে পারে না। উক্ত গ্রন্থে ঈদুল আজহার কথাও আছে। সেদিন ছিল ২২শে মার্চ, বুধবার। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'আজ কোরবানির ঈদ। গত ঈদেও জেলে ছিলাম। এবারও জেলে। বন্দিজীবনে ঈদ উদ্‌যাপন করা একটি মর্মান্তিক ঘটনা বলা চলে। বার বার আপনজন, বন্ধুবান্ধব, ছেলেমেয়ে, পিতামাতার কথা মনে পড়ে। আমি তো একলা থাকি। আমার সাথে কোনো রাজনৈতিক বন্দিকে থাকতে দেয় না। একাকী কি ঈদ উদ্‌যাপন করা যায়?' যদিও এমন বেদনার মধ্য দিয়েও বঙ্গবন্ধুকে ঈদের দিন পালন করতে হয়েছে। ১৯৬৭ সালের দুবছর পর ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধু ঈদ পালন করতে তাঁর গ্রাম টুঙ্গিপাড়ায় গিয়েছিলেন। সেসময় তাঁর মা সায়ারা খাতুন অসুস্থ ছিলেন। বাংলাদেশের প্রথম সারির একজন কবি ও লেখক নির্মলেন্দু গুণ লিখেছেন, '২৭ ফেব্রুয়ারি রাতে তিনি গ্রামের বাড়িতে অবস্থানরত তাঁর অসুস্থ মায়ের সঙ্গে ঈদ পালন করার জন্য স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে টুঙ্গিপাড়ায় যান। তেত্রিশ মাস একনাগাড়ে কারাবন্দি থাকার কারণে বিগত ছয়-ছয়টি ঈদ উৎসবের আনন্দ থেকে তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা বঞ্চিত থেকেছে।'

অনেকদিন পর বঙ্গবন্ধুর পরিবারে ফিরে এসেছে ঈদের আনন্দ। ঐ পরিবারের ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে দেশের মানুষের মনে। রাজনীতি ও মানুষের কল্যাণে কাজ করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর বেশির ভাগ সময় কেটেছে জনতার সঙ্গে। সেজন্য পরিবারকে তিনি ভালোভাবে সময় দিতে পারেননি। তাই যেবার তিনি পরিবার-পরিজন নিয়ে ঈদ করতেন সেবার তাঁর পরিবারে আনন্দের জোয়ার বয়ে যেত। স্বাধীন বাংলাদেশে ঈদুল আজহা উদ্‌যাপন নিঃসন্দেহে ছিল ঐতিহাসিক ঘটনা। বাংলাদেশে তখন স্বাধীনতার পতাকা উড়ছে। সদ্য স্বাধীন দেশ গড়ার কাজ চলছে পুরোদমে। তাই ১৯৭২ সালের ঈদ ভিন্ন মাত্রা নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে হাজির হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যে বাণী দিয়েছিলেন তাতে লিখেন, 'ঈদুল আজহা আমাদের আত্মত্যাগের আদর্শ শিক্ষা দেয়। বাংলাদেশের সাহসী মানুষ দেশকে স্বাধীন করার জন্য সম্পদ ও রক্ত দিয়ে চরম আত্মত্যাগ স্বীকার করেছেন।' তিনি চরম আত্মত্যাগের মনোভাব নিয়ে ঈদুল আজহা উদ্‌যাপন করার আহ্বান জানান। ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর প্রথম ঈদ। সাধারণ মানুষ হিসেবে প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঈদ আনন্দ ভাগ করে নিতেই বঙ্গবন্ধু ভালোবাসতেন। প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাও তাঁর পিতার মতো সাধারণভাবে ঈদ উদ্‌যাপন করতে পছন্দ করেন। জননেত্রীর ঈদের সময় কাটে তাঁর পরিবার-পরিজন ও বাংলার জনগণের সঙ্গে। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী হয়েও ঈদ আনন্দ ছড়িয়ে দেন বাংলাদেশের জনগণ ও দলীয় কর্মীদের মাঝে। পিতার আদর্শই গ্রহণ করে দেশ পরিচালনা করছেন তিনি। সেই আনন্দকে সামনে রেখে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান শেখ মুজিবের প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। কারণ বঙ্গবন্ধু কেবল জনগণকে আত্মত্যাগ করতে বলেননি, তিনি নিজেও সারাজীবন আত্মত্যাগ করে গেছেন। সেই শৈশব থেকে আমৃত্যু সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন। তাই তো তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। তিনি স্বপ্ন দেখতেন ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের। আসুন, আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উদ্ভাসিত হই। পবিত্র ঈদে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সফল করার শপথ নিই এবং প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে সোনার বাংলাদেশ গঠনে সহযোগিতা করি। ঈদ বাংলাদেশের জন্য কল্যাণ বয়ে আনুক, আপামর মানুষের মুখে হাসি ফোটাক এই কামনা করছি।

আজহার মাহমুদ: সাংবাদিক, রিপোর্টার, চট্টগ্রাম সময়,
azharmahmud705@gmail.com

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান ও হেড অব স্টেট মাও সে তুং-এর সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন শেখ মুজিবুর রহমান (অক্টোবর ১৯৫৭)

আমার দেখা নয়াচীন

চীনাদের দেশপ্রেমের অনন্য উপস্থাপন

শহিদুল ইসলাম

নবিজি (সা.) বলেন যে, জ্ঞান অর্জন করতে যদি সুদূর চীন দেশেও যাওয়া লাগে তবুও যাও। তদানীন্তন বিশ্বে চীনারা ছিল জ্ঞানবিজ্ঞানে অগ্রসর। তারা সুন্দর সভ্যতা নির্মাণ করতে পেরেছিল। চীনে যখন কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠা হলো তখন তারা কীভাবে নিজেদের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেছে তা দেখার ইচ্ছা বঙ্গবন্ধুর ছিল। *আমার দেখা নয়াচীন* গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু মওলানা ভাসানীর একটি কথা দিয়েই গ্রন্থটি শুরু করেন এভাবে– '১৯৫২ সালে জেল হতে বের হলাম, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পর। জেলে থাকতে ভাবতাম আর মাঝে মাঝে মওলানা ভাসানী সাহেবও বলতেন, যদি সুযোগ পাও একবার চীন দেশে যেও।'

১৯৫২ সালের ২-১২ই অক্টোবর চীনের পিকিংয়ে এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে নয়াচীন সফর করেন। ১৯৫৪ সালে কারাগারে বন্দি অবস্থায় তিনি গ্রন্থটি রচনা করেন। *আমার দেখা নয়াচীন* গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভ্রমণ কাহিনি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন। ভ্রমণের প্রস্তুতি হিসেবে পাসপোর্ট-ভিসার প্রয়োজন হয়। পাকিস্তানের তৎকালীন রাজধানী ছিল করাচি। করাচিতে পাসপোর্টের আবেদন পাঠাতে হতো। ভিসার জন্যও পশ্চিম পাকিস্তান যেতে হতো। সব কিছু ঠিকঠাক হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু যাত্রা শুরু করেন।

বঙ্গবন্ধু বার্মায় যাত্রা বিরতি করেন। বার্মার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট তিনি বর্ণনা করেছেন। জাতিগত সংঘাত তিনি দেখেছেন। একটি জঙ্গলময় দেশ। বিরাট বিরাট পাহাড়, নদীর সংখ্যাও বেশি। ভোরে ব্যাংকক যাওয়ার পালা। প্রায় তিন ঘণ্টা পর বিমান ব্যাংককে পৌঁছাল। এক ঘণ্টা বিরতির পর আবার হংকং পৌঁছাল প্লেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'প্লেন উড়ে চলল প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে। মেঘের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় প্লেন নিচের দিকে নেমে পড়ে তাতে অনেকের দম নিতে কষ্ট হয়। কারণ মেঘের মধ্যে হাওয়া থাকে না।'

কমিউনিস্ট অধ্যুষিত দেশ চীন। মাও সে তুং বিপ্লব করে চীনে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। চীনে ঢুকে পিকিং শহর দেখার পালা। বহু রাজার রাজধানী ছিল পিকিং। বহু বিদেশি অনেকবার এই শহর দখল করেছে। চীন-জাপান যুদ্ধে জাপানিরা এই শহর দখল করে। পরবর্তীতে শহরটি চিয়াং কাইসেকের হাতে ছিল। শেষে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে এই শহরটা দখল করে চীনের রাজধানী বানায়। এই শহর দেখার আগ্রহ বঙ্গবন্ধুর পূর্ব থেকেই ছিল।

বঙ্গবন্ধুর সফরসঙ্গী ছিলেন আতাউর রহমান খান, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ও ইউসুফ হাসান প্রমুখ। বঙ্গবন্ধু দেখলেন কমিউনিস্ট সরকার মসজিদ,

মাদ্রাসা, কোরান পড়া বন্ধ করেছেন কি না? তিনি এটার কোনো প্রমাণ পাননি। তিনি পিকিং, তিয়ানজিং, নানকিং, ক্যান্টন, হ্যাংবো শহরে ঘুরেছেন। তিনি দেশীয় শিল্পপণ্যের ব্যবহার দেখলেন। কাপড়, জুতা, সাইকেল, ঘড়ি, কলম, স্নো, পাউডার, পুতুল এগুলোর কোনোটিই বিদেশ থেকে আনা হয় না। এমনকি একটি ব্লেডও না। ব্লেড দেশীয় নয় বলে তার আমদানি নিষিদ্ধ। কত দেশপ্রেম তাদের।

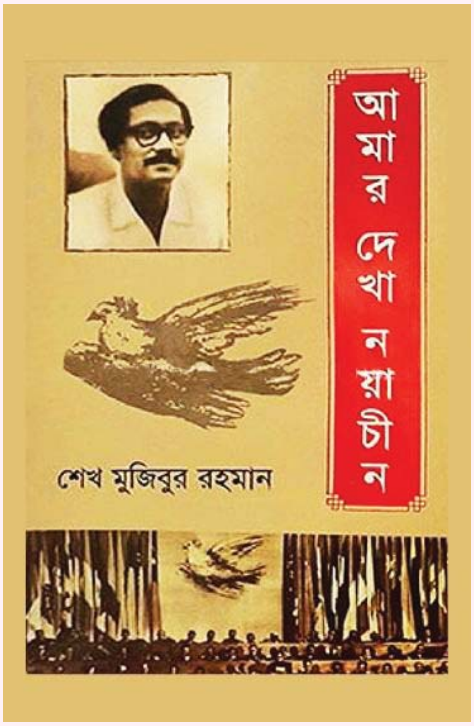

মাও সে তুং ৬০ কোটি লোকের নেতা। ১লা অক্টোবর নয়াচীনের স্বাধীনতা দিবস। বঙ্গবন্ধু নয়াচীনের স্বাধীনতা দিবসের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে– 'আমরা এক পাশে শান্তি সম্মেলনে ডেলিগেটরা দাঁড়ালাম, আর একদিকে রাষ্ট্রদূত ও তাঁদের অফিসের কর্মচারীবৃন্দ। আমাদের কাছাকাছি একটু পিছনে প্রাসাদের সম্মুখে মাও সে তুং, চৌ এন লাই, চ্যু তে ও অন্যান্য মন্ত্রীগণ এসে দাঁড়ালেন। মাও সে তুং যখন এসে দাঁড়ালেন তখন জনতা চিৎকার করে মাওকে অভ্যর্থনা জানালো।'

সেনা, নৌ, বিমানবাহিনী এবং মহিলা ন্যাশনাল গার্ড-এর প্যারেড। শান্তির পতাকা সবার হাতে হাতে আর আকাশ ভরে গেল শান্তিতে। কবুতর উড়াউড়িতে। প্রায় ২৫ লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়েছিল উক্ত অনুষ্ঠানে। বঙ্গবন্ধু চীন সফর করে দেখলেন যে, স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে কাজ করবে। এটি সরকারি নির্দেশ। ঘুষ, সুদ, পতিতাবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি তুলে দেওয়া হয়েছে সমাজ থেকে। ঘুষখোরের শাস্তি ছিল ফাঁসি, এই সময় থেকে সমাজে কোনো ঘুষখোর ছিল না। সুতা, কাপড়ের সমস্যা সমাধান দেওয়ার জন্য বিদেশনির্ভর নয় বরং দেশীয় বস্ত্র পরার তাগিদ দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর বইতে উল্লেখ করেন– 'নয়াচীন সরকার কাপড়ের কলগুলিকে হুকুম দিয়েছেন সুতা তৈয়ার করতে। সেই সুতা বিলি করা হবে সরকারি কর্মচারীদের মাধ্যমে গরিব তাঁতিদের কাছে। গরিব তাঁতিরা কাপড় তৈয়ার করে সরকারি সেক্টরে জমা দেয়। এভাবে লক্ষ লক্ষ বেকার তাঁতি কাজ করছে। বিদেশি কাপড় আনতে হচ্ছে না।' বঙ্গবন্ধু তাঁর বইতে বিভিন্ন পেশার লোকদের কথা উল্লেখ করেছেন। বিনিয়োগবিহীন ব্যাবসার কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে সাম্প্রদায়িকতার নমুনা খুবই কম। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ চীন। নয়াচীন সরকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসাধারণের সমর্থন পেয়েছে। সরকারি দপ্তর, সেনাবাহিনী, গভর্নরদের অনেকেই আছে মুসলিম সম্প্রদায়ের, তাদের মধ্যে বন্ধন দেখেছেন।

নয়াচীনে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, বাণিজ্য, কলকারখানা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন দেখে বঙ্গবন্ধু অভিভূত। তারা কৃষিতে অধিক উৎপাদনের জন্য পতিত জমির পাশাপাশি অব্যবহৃত জমিতে ফসল ফলানোর ব্যবস্থা করছে। শিক্ষা, কৃষি এবং শিল্প ক্ষেত্রে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। দুনিয়ার যে-কোনো শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করতে তারা আজ প্রস্তুত। কিন্তু নয়াচীন সরকার কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন ব্যক্তি ছাড়া আর কাউকে রাজনীতি করার সুযোগ দেয়নি। একমাত্র নয়াচীন নেতা মাও সে তুং-এর নব্য গণতন্ত্রের নীতি যারা বিশ্বাস করেন তারাই রাজনীতি করার অধিকার পাবে। বঙ্গবন্ধু গ্রন্থের শেষে বলেন, 'আমার মতে ভাত-কাপড় পরার ও আদায় করে নেবার অধিকার মানুষের থাকবে। সাথে সাথে নিজের মতবাদ প্রচার করার অধিকারও মানুষের থাকা চাই। তা না হলে মানুষের জীবনবোধ পাথরের মতো শুষ্ক হয়ে যায়।'

গ্রন্থটিতে বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক চিন্তা, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিচয় গভীরভাবে ফুটে উঠেছে। অত্যন্ত দূরদর্শিতার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু নয়াচীনের প্রস্তুতির ঘটনাবলি তাঁর নজরে এনেছিলেন। তিনি সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশ চীনকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। চীনাদের সৌন্দর্যবোধ, জীবন, সমাজ ও ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসার ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর বর্ণনায়। গ্রন্থের শেষে আছে দুর্লভ ছবি যা গ্রন্থটিকে আকর্ষণীয় করেছে। এই ভ্রমণ কাহিনি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর রচিত *আমার দেখা নয়াচীন* পাঠকদের আকর্ষণ করবে যুগ-যুগান্তরে।

শহিদুল ইসলাম: প্রাবন্ধিক ও প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, সরকারি ইস্পাহানী ডিগ্রি কলেজ, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা, shahidulislamiuc@gmail.com

বাংলাদেশ ও ভারতের জাতির পিতার ভাস্কর্য

কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশন এশিয়ার অন্যতম ব্যস্ততম রেলওয়ে স্টেশন। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার এই শিয়ালদহ স্টেশনের মূল গেট থেকে নেমে উলটো দিকেই সর্বোচ্চ ১০০ মিটার দূরত্বে রয়েছে এনআরএস হাসপাতাল। আর সেই হাসপাতালের ডান দিকের প্রাচীরের গায়েই শোভা পাচ্ছে ভারত ও বাংলাদেশের জাতির পিতার বিশাল আবক্ষ মূর্তি। একদিকে ভারতের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী, অন্যদিকে বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তবে স্থাপিত হওয়া দুই জাতির পিতার মূর্তি কোনো সরকারি অর্থায়নে হয়নি। এই মূর্তি স্থাপন করেছেন বিধায়ক পরেশ পাল। বছরখানেক আগে দুই দেশের জাতির পিতার আবক্ষ মূর্তি বসানোর পরিকল্পনা নেন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেসের বেলেঘাটা কেন্দ্রের এই বিধায়ক। এরপর শুরু হয় মূর্তি তৈরির কাজ। সম্প্রতি এই দুই মূর্তির আবক্ষ উন্মোচন করেন বিধায়ক। বঙ্গবন্ধুর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ভাস্কর্য জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন: আনিকা তাবাসসুম

বরেণ্য চলচ্চিত্র শিল্পীদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধু ও চলচ্চিত্র

জেসিকা হোসেন

বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সবক্ষেত্রেই তিনি অভাবনীয় সাফল্য দেখতে চেয়েছিলেন। সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় তাঁরই হাতে চলচ্চিত্র শিল্পের গোড়াপত্তন হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু চলচ্চিত্র শিল্পকে এগিয়ে নিতে বেশ কিছু মাইলফলক উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যা আজ পর্যন্ত চলচ্চিত্রের পথচলায় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। ১৯৫৭ সালে এফডিসি প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান অনস্বীকার্য। প্রতিবছর প্রতি মাসের নির্দিষ্ট কিছু দিনে বিভিন্ন দেশে কিছু দিবস পালিত হয়। কোনো নির্দিষ্ট দিনে অতীতের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে স্মরণ করা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি করতে এই সমস্ত দিবস পালিত হয়। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশে পালিত সেই সমস্ত দিবসগুলোর মধ্যে একটি হলো 'জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস'। ১৯৫৭ সালের ২৭শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি রোধ ও গ্রামীণ সহায়তা বিষয়ক মন্ত্রী থাকা অবস্থায় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (ইপিএফডিসি) বিল উপস্থাপন করেন, যা সে বছরের ৩রা এপ্রিল পাস হয়। জাতির পিতার এ উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় বাংলা চলচ্চিত্রের অগ্রযাত্রায় একটি মাইলফলক হিসেবে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আজকের বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)। ২০১২ সাল থেকে ৩রা এপ্রিল সরকারিভাবে 'জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। বাংলাদেশ ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এবং ন্যাশনাল ফিল্ম অবজারভ্যান্স কমিটি এই দিবস উদ্‌যাপনের প্রধান আয়োজক।

বাংলাদেশে ১৮৯০-এর দশকে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী শুরু হয়েছিল। প্রথমে নির্বাক এবং পরে সবাক চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন শুরু হয়। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের প্রথম নির্মাতা ও প্রদর্শক দুই সহোদর হীরালাল সেন ও মতিলাল সেন। রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানি গঠন করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, রাজশাহীসহ বিভিন্ন জেলায় চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। বঙ্গসন্তান হীরালাল সেন ভারতীয় উপমহাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের জনক। ১৯৫৬ সালে ঢাকায় প্রথম সবাক চলচ্চিত্র *মুখ ও মুখোশ* মুক্তি পায়। তবে ১৯৩১ সালে মুক্তি পাওয়া *দ্য লাস্ট কিস* ছিল ঢাকার প্রথম ছবি। ছবিটি পরিচালনা করেন অম্বুজ গুপ্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে আর্মেনিয়ান স্ট্রিটে প্রতিষ্ঠিত প্রথম সিনেমা হল হলো পিকচার হার্ডস। ১৯৫৬ সালে এই সিনেমা হলের মালিক মুস্তাফা এটির নাম বদলে রাখেন শাবিস্তান। ঢাকায় প্রথম নিয়মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শন শুরু হয় এই সিনেমা হলে। ঢাকার প্রথম সিনেমাস্কোপ ছবি *বাহানা*। ১৯৬৫ সালে এ ছবি মুক্তি পায় এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রঙিন ছবি *বাদশা* ১৯৭৫ সালে মুক্তি পায়।

বঙ্গবন্ধুর আমলে চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সংযোজন হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই এ প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং ১৯৭২ সালে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাহিনিচিত্র নির্মাণ। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পূর্ণদৈর্ঘ্যের প্রথম ছবি *ওরা ১১ জন* যেটি মুক্তি পায় ১৯৭২ সালে। ছবিটি পরিচালনা করেন চাষী নজরুল ইসলাম আর প্রযোজনা করেন মাসুদ পারভেজ। এছাড়াও পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের ওপর বহু সিনেমা তৈরি হয়েছে। ১৯৭৬ সালে প্রথম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৬ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সেরা ছবির পুরস্কার পায় *লাঠিয়াল*, সেরা পরিচালক হন নারায়ণ ঘোষ মিতা এবং সেরা অভিনেতা হন আনোয়ার হোসেন। জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শিত ছবি পরীক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড। প্রতিটি ফিল্মের সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পেতে হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে প্রতিষ্ঠিত এদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে নতুন প্রাণ সঞ্চার করছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর নেতৃত্বে আমরা ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে যেমন স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছে দেব, তেমনই বঙ্গবন্ধুর হাতে যাত্রা শুরু হওয়া আমাদের চলচ্চিত্র বিশ্ব বাজারে একটি বিশেষ স্থান করে নিবে।

জেসিকা হোসেন : প্রাবন্ধিক

ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ২রা এপ্রিল ২০২৩ অটিজম সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননাপ্রাপ্তদের মাঝে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ ও সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মো. আশরাফ আলী খান খসরু –পিআইডি

অটিজম সচেতনতায় সরকারের নানা উদ্যোগ

নাসরিন সুলতানা

'Transformation: Towards a Neuro Inclusive World for All' অর্থাৎ 'রূপান্তরের অভিযাত্রায় সবার জন্য নিউরোবান্ধব অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্ব গঠন'– এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২রা এপ্রিল বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালিত হয়। এই দিনটিতে জাতিসংঘ বিশ্বজুড়ে তার সদস্য দেশগুলোকে অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার (এএসডি) আক্রান্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণে উৎসাহিত করে। দিবসটি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ৬২/১৯৯ ধারা অনুযায়ী মনোনয়ন লাভ করে। 'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস' প্রস্তাবটি ২০০৭ সালের ১লা নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পাস হয়েছিল এবং সেটি গৃহীত হয়েছিল একই বছরের ১৮ই ডিসেম্বর। এটি প্রস্তাব করেছিলেন জাতিসংঘে কাতারের প্রতিনিধিবৃন্দ যাদের মধ্যে ছিলেন প্রিন্সেস শিখা মোজাহ বিনতে নাসের আল-মিসনদ এবং তার স্বামী, কাতার রাজ্যের আমির শেখ হামাদ বিন খলিফা আল-থানি। সকল সদস্যরাষ্ট্র তাদের এ প্রস্তাবকে সমর্থন করে। এই প্রস্তাবনাটি জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বিনা ভোটে পাস এবং গৃহীত হয়েছিল। মূলত মানবাধিকার উন্নয়নে জাতিসংঘের পূর্ববর্তী উদ্যোগসমূহের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবেই এমনটি করা হয়েছিল। বিশ্ব অটিজম দিবস স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জাতিসংঘের সাতটি দিবসের মধ্যে অন্যতম।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর তনয়া সায়মা ওয়াজেদ হোসেন পুতুলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অটিজম মোকাবিলায় বাংলাদেশ বিশ্বে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দক্ষ-অভিজ্ঞ প্রশিক্ষিতদের তত্ত্বাবধান, বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচির ব্যবস্থা, প্রত্যেক শিশুর বিশেষ চাহিদা পূরণ, বিকলাঙ্গ শিশুদের আর্থিকভাবে বিশেষ ব্যবস্থার আওতায় আনা এবং মানসিক ও শারীরিক উভয় ধরনের অটিস্টিক শিশুদের উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সায়মা ওয়াজেদ পুতুল লাইসেন্সপ্রাপ্ত স্কুল সাইকোলজিস্ট, ব্যারি ইউনিভার্সিটির স্কুল সাইকোলজি বিভাগের ক্লিনিক্যাল ইন্সট্রাক্টর, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালকের অটিজম ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেষ্টা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্যানেলের সদস্য, ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম-এর 'ভালনারেবিলিটি' বিষয়ক শুভেচ্ছাদূত, অটিজম ও নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারস বিষয়ক ক্লাইমেট ভালনারেবল জাতীয় অ্যাডভাইজরি কমিটি ও সূচনা ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সায়মা ওয়াজেদ পুতুল ২০০৮ থেকে শিশুদের অটিজম ও স্নায়ুবিক জটিলতা-সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর কাজ শুরু করেন। এছাড়া বাংলাদেশের অটিজম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারপারসন হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। অটিজম বিশেষজ্ঞ হিসেবে সুপরিচিত সায়মা ওয়াজেদ পুতুল অল্প সময়ের মধ্যেই নিজের কাজের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে প্রশংসা পেয়েছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৪-এর সেপ্টেম্বরে তাঁকে 'হু অ্যাক্সিলেন্স' অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে। মনস্তত্ত্ববিদ সায়মা ওয়াজেদ যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান অটিজম স্পিকস-এর পরামর্শক হিসেবেও কাজ করেন। তিনি ২০১৩-এর জুন থেকে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞ পরামর্শক প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত হন। সারা বিশ্বেই তিনি অটিস্টিক শিশুদের অধিকারসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের উদ্যোগে ২০১১ সালে ঢাকায় প্রথমবারের মতো অটিজম বিষয়ক আর্ন্তজাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গঠিত হয় 'South Asian Autism Network (SAAN)' যার সদর দপ্তর করা হয় বাংলাদেশে। তাঁর চেষ্টাতেই বাংলাদেশে 'নিউরোডেভেলপমেন্ট ডিজ্যাবিলিটি ট্রাস্ট অ্যাক্ট ২০১৩' পাস করা হয়। বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সৃষ্টিশীল নারী নেতৃত্বের ১০০ জনের তালিকায়ও স্থান করে নিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশে অটিজম বিষয়ক বিভিন্ন নীতি-নির্ধারণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছাদূত হিসেবেও কাজ করছেন সায়মা ওয়াজেদ। ২০১৬ সালে তিনি প্রতিবন্ধীদের ডিজিটাল ক্ষমতায়নের জন্য ইউনেসকোর আন্তর্জাতিক জুরি বোর্ডেও সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। অটিজম নিয়ে আরও ব্যাপক আকারে কাজ করতে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল প্রতিষ্ঠা করেছেন 'সূচনা ফাউন্ডেশন' নামের একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান।

সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের ঐকান্তিক চেষ্টায় অটিজমের গুরুত্ব ও সচেতনতা জাতীয়-আন্তর্জাতিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ

অটিজম-সংক্রান্ত কার্যক্রমে এগিয়েছে অভাবনীয়ভাবে। ১৪টি মন্ত্রণালয় নিয়ে গঠিত হয়েছে জাতীয় টাস্কফোর্স। ৮টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি। এর মধ্যে প্রথম সারির ৫টি হলো– সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। পুতুলের অনুপ্রেরণায় বেসরকারি পর্যায়েও অনেক প্রতিষ্ঠান অটিজম ও নিউরোডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে কাজ করতে উৎসাহী হয়েছে। অটিজম ও নিউরোডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপারসন সায়মা ওয়াজেদ পুতুল কখনও সরাসরি, কখনও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সব জাতীয় কর্মকাণ্ডের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

ইতোমধ্যে দেশে অটিজম সংক্রান্ত বেশকিছু চিকিৎসা সহায়তা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে যেমন– ইনস্টিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিজঅর্ডার অ্যান্ড অটিজম (IPNA) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, চাইল্ড গাইডেন্স ক্লিনিক, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, প্রয়াস বিশেষায়িত স্কুল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশুরোগ বা মনোরোগবিদ্যা বিভাগ, নিকটস্থ জেলা সদর হাসপাতাল বা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও বিশেষায়িত স্কুল, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন।

Early Screening, Detection Assessment ও Early Intervention নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় পরিচালিত ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে একটি করে অটিজম ও নিউরোডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীবান্ধব সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে ২০১০ সালে একটি অটিজম রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত সেন্টার থেকে অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিবর্গকে বিনামূল্যে নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের থেরাপি সেবা, গ্রুপ থেরাপি, দৈনন্দিন কার্যবিধি প্রশিক্ষণসহ রেফারেল ও অটিজম সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের পিতা-মাতাদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১০ সালে চালু হওয়ার পর থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৮০০০ জন অটিজম সমস্যাগ্রস্ত শিশু ও ব্যক্তিকে বিনামূল্যে ম্যানুয়াল ও Instrumental থেরাপি সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে ২০১১ সালের অক্টোবর মাসে একটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম চালু করা হয়। পরবর্তীতে ঢাকা শহরে মিরপুর, লালবাগ, উত্তরা, যাত্রাবাড়ি ও ৬টি বিভাগীয় শহরে (রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, রংপুর ও সিলেট), গাইবান্ধা জেলায় ১টি এবং বিশ্বনাথ উপজেলায় ১টিসহ মোট ১২টি স্কুল চালু করা হয়েছে। উক্ত স্কুলগুলোতে অটিজম ও এনডিডি সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের অক্ষর জ্ঞান, সংখ্যা, কালার ম্যাচিং, এডিএল, মিউজিক, খেলাধুলা, সাধারণ জ্ঞান, যোগাযোগ, সামাজিকতা, আচরণ পরিবর্তন এবং পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এসব স্কুলে চলতি শিক্ষাবর্ষে মোট ১৬০ জন অটিজম সমস্যাগ্রস্ত শিশু বিনামূল্যে লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে অনুদান/ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের কল্যাণে তহবিল থেকে ২০০৩-২০০৪ থেকে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রায় ১৬ কোটি টাকা অনুদান ও ঋণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কর্মরত বেসরকারি সংস্থার মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৯,৪৩,৮৪১ টাকা ১৩৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানেও এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে ২০১৬ সালে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে ও ২০১৮ সালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দুই দিনব্যাপী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান মেলার আয়োজন করা হয়। ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত ৬০,৩৪২টি সহায়ক উপকরণ (কৃত্রিম অঙ্গ, হুইল চেয়ার , ট্রাইসাইকেল, ক্রাচ, স্ট্যান্ডিং ফ্রেম, ওয়ার্কিং ফ্রেম, সাদাছড়ি, এলবো ক্রাচ, আয়বর্ধক উপকরণ হিসেবে সেলাই মেশিনসহ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

২রা এপ্রিল ২০১০ প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র শীর্ষক কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। এ কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে ১০৩টি কেন্দ্রের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২১১টি উপজেলায় প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে।

বিশ্বে অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যেখানে অটিস্টিক শিশুদের মধ্য থেকে তৈরি হয়েছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশের শিশুরা সে পথেই হাঁটছে। অটিজমের শিকার একজন মানুষ আর দশজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে কোনো দিক দিয়ে কম নয়। তাদের দরকার শুধু একটি সহমর্মিতায় ভরা পরিবেশ, শেখার সুযোগ আর তাদের প্রতি সমতাপূর্ণ দৃষ্টি– এটুকু দিতে পারলে এই মানুষগুলো সমাজের সবাইকে সাথে নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

নাসরিন সুলতানা: প্রাবন্ধিক

প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ১৯৭১-এর গণহত্যার ওপর আলোকচিত্র প্রদর্শন

বাংলাদেশের মাটিতে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরোচিত গণহত্যার ওপর প্রথমবারের মতো নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আলোকচিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়। ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে ১৯৭১ সালের গণহত্যার ওপর ২৭টি আলোকচিত্র সংগ্রহ করে প্রদর্শনীতে উপস্থাপন করা হয়। ৩০শে মার্চ প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। এসময় জাতিসংঘের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি, জাতিসংঘের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, নিউইয়র্কে বসবাসরত প্রবাসী বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সিনিয়র সচিব বলেন, জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আয়োজিত এ প্রদর্শনী ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের অব্যাহত প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

প্রতিবেদন: মুবিন হক

এক কবির গল্প

মাহবুব রেজা

এই কয়েকটা দিন খোকা বেশ একটা বিপদের মধ্যে মানে ঘোরের মধ্যে কাটিয়েছে। কাউকে বলাও যায়নি তা। তবে এ সময়ের পুরোটা খোকা দোতলার চিলেকোঠায় তার বড়ো কাকার পড়ার ঘরে ছিল। বড়ো কাকার বেশ নামডাক। সবাই তাকে চেনেন। খোকার বড়ো কাকার নামের আগে কথাসাহিত্যিক লেখেন। এ ব্যাপারটা নিয়ে খোকার প্রথম প্রথম খটকা লাগত। এ নিয়ে খোকা বড়ো কাকাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা কাকা, তোমার নামের আগে সবাই 'কথাসাহিত্যিক' লেখে কেনো? এর মানেটা কী?

বড়ো কাকা তখন চোখের চশমা আকাশের দিকে ঠেলে উত্তর দিয়েছিলেন, আমরা মানুষের মুখের কথা, জীবনের কথাকে পুঁজি করে 'করে-কেটে' খাই তো তাই আমাদের নামের আগে ঐ বিশেষণ। হা হা হা বলে বড়ো কাকার দম ফাটানো হাসি। খোকা বড়ো কাকার কথার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারল না। তবে বড়ো কাকার হাসি দেখে খোকা না হেসে পারল না।

আজ খোকার বিপদের দিন এসে গেছে। ওদের স্কুলে আজ রচনা প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে। রচনার বিষয় সপ্তাহখানেক আগেই দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেদিন স্কুলে মোশারফ হোসেন স্যার ক্লাসে এসে রচনা প্রতিযোগিতার কথাটি বলেছিলেন। স্যার খাঁটি বিক্রমপুইরা ল্যাংগুয়েজে কথা বলেন। স্যার বললেন, শোনো বাচ্চারা তোমাগো লাইগা একটা রচনা কনটেস্টের আয়োজন হইছে, বুচ্ছো? রচনার বিষয়ডা হইলো– কে বড়ো কবি? স্যার আরেকটু পরিষ্কার করে বললেন, তোমার ভাবনার মইধ্যে, চিন্তার মইধ্যে যেই কবিরে বড়ো বইলা মনে হইবো, যুক্তি দিয়া বিবেচনা কইরা তারে লইয়াই লেখবা রচনা, বড়ো কবি। কী কইছি বুচ্ছো?

সেদিনের ক্লাসের সেই ঘোষণার পর থেকে খোকার বিপদের স্টার্ট। আজ খোকার সেই বিপদের চূড়ান্ত দিনক্ষণ। খোকা রচনাটা লিখেছে বেশ যত্ন করে। খেটেখুঁটে। বড়ো কাকার পড়ার ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বইপত্তর নেড়েচেড়ে, গবেষণা করে সে তার এই রচনা তৈরি করেছে। মাঝেমধ্যে বাবা-মা, বড়ো'পা এসে খোকার মনোযোগে আঘাত হেনেছে ঠিকই তবে খুব একটা ক্ষতি করতে পারেনি। সবার কথার পৃষ্ঠে খোকা একটা যুতসই জবাবই দিয়েছিল আর তা হলো– 'তোমাদের খোকা বড়ো বিপদের মধ্যে আছে। তাকে যদি তোমরা একটু একাকী থাকতে দাও তবেই সে এই ভয়ংকর বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারে।' খোকার এই কথার পর তাকে নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামাতে সাহস পায়নি। বরং খোকার কথা শুনে সবাই না হেসে পারেনি। খোকা ওর বড়ো কাকার মতোই কথা বলতে শিখেছে।

স্কুলে ঢুকতেই খোকা টের পেল একটা সাজ-সাজ রব। স্কুলের গেটে দেখা হয়ে গেল ক্লাস টেনের শাহীন ভায়ের সঙ্গে। সবার কাছে শাহীন ভাই 'ভাবুক শাহীন' নামে পরিচিত। কারণ খোকাদের স্কুলে শাহীন নামে মোটমাট সতেরো জন রয়েছে। এদের চেনার সুবিধার্থে মানে পৃথকীকরণের জন্য মজার মজার পদ্ধতি রয়েছে। যেমন– বসুবাজার শাহীন, বনগ্রাম শাহীন, শাহসাহেব বাড়ি শাহীন, কালা শাহীন, ঠ্যাটা শাহীন, দাঁতাল শাহীন (যার দাঁত বড়ো), চিকন শাহীন, ঘাউড়া শাহীন, রেললাইন (দয়াগঞ্জ থেকে যে শাহীন রেললাইন দিয়ে যাতায়াত করে) শাহীন, ভটু শাহীন, পাকিস্তানি শাহীন, আরমানিটোলা শাহীন, চাপাবাজ শাহীন, পাতলা (পাতলা খান লেনে থাকে বলে) শাহীন, হাফ কানা (এক চোখ কানা বলে) শাহীন প্রভৃতি। তো ভাবুক শাহীন ভাই খুব হন্তদন্ত হয়ে স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। খোকাকে দেখা মাত্র ভাবুক শাহীন ভাই আরও বেশি ব্যস্ততার ভাব ফুটিয়ে তুলে বললেন, খোকা আর বোলো না, আজকাল যে কী হয়েছে বুঝি না। ভুল করে রচনা না এনে বাবার কোর্টের কাগজপত্র নিয়ে এসেছি। আমার যে কী হবে? বলতে বলতে তিনি দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। ভাবটা এরকম শাহীন ভাই যদি দয়া করে রচনা জমা না দেন তাহলে বিচারকরা বিব্রতকর অবস্থায় পড়বেন প্রথম স্থান নির্ধারণ করা নিয়ে। শাহীন ভাই যেন বিচারকদের সেই বিব্রতকর অবস্থা থেকে বাঁচাতেই কেবল বাড়ি যাচ্ছেন, এর বাইরে আর কিছু নয়।

ক্লাসে ঢুকতেই সবাই হুড়মুড় করে খোকাকে জেঁকে ধরল। সবার মুখে নানান প্রশ্ন। খোকার যে আবার লেখার হাত রয়েছে এটা সবাই জানে। কী লিখেছিস? কোন কবিকে বড়ো বানালি? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে কতজনের নাম যে বলল ওরা তার লিস্ট করতে গেলে চার ফর্মা শেষ হয়ে যাবে। খোকা কোনো কথা বলল না। সে খুব টেনশনে আছে। খোকা চুপচাপ বসে থাকল বেঞ্চিতে। একসময় শ্রেণি শিক্ষক শ্রী জ্যোতির্ময় বিশ্বাস ক্লাসে এসে ঢুকলেন। নাম ডাকলেন। তারপর সবার কাছ থেকে রচনা সংগ্রহ করলেন। চলে যাওয়ার সময় তিনি বললেন, তোমরা সবাই চুপচাপ থাকবে। দুপুরের পর অনুষ্ঠান শুরু হবে। এর মধ্যে বিচারকরা তোমাদের রচনা যাচাই-বাছাই করবেন। প্রধান অতিথি তোমাদের কয়েকজনের রচনা পড়ে বিজয়ীদের নাম

ঘোষণা করবেন। তারপর পুরস্কার দেওয়া হবে।

খোকা দাঁড়িয়ে বলল, স্যার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে কে আসবেন?

জ্যোতির্ময় বিশ্বাস রহস্যময় এক হাসি ছড়িয়ে দিলেন সারা ক্লাসে। তারপর শুধু একটি মাত্র শব্দ তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল, 'কবি'।

এখনই তার নাম বলা বারণ।

স্যার চলে যাওয়ার পর স্কুলের সবাই টেনশনে আছে। আজ অলিখিত ছুটি। কোনো ক্লাসট্রাস নেই। ক্লাসরুমে কেবল আড্ডা। এর ফাঁকে দুপুরের টিফিন। তারপর অনুষ্ঠান। আজ শিক্ষকদের রুমের চারপাশে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা হয়েছে। কোনো ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষকদের রুমের ধারেকাছে দেখা গেলে তার বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে মামলাও ঠুকে দেওয়া হতে পারে– এমন গুজবও কেউ কেউ নিজ দায়িত্বে চাউর করে দিয়েছে।

দুপুরের পর অনুষ্ঠান শুরু হবে। প্রধান অতিথি এখনও এসে পৌঁছাননি। হলরুমে সবাই এসে জড়ো হয়েছে। মঞ্চটাকে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। মঞ্চের পেছনে টকটকে লাল সূর্যের ভেতর থেকে একদল শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষ হাত উঁচিয়ে যেন মঞ্চ ছেড়ে খোকাদের সঙ্গে এসে মিশবে এমন ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। খোকার খুব ভালোলাগে। সেও ওদের সঙ্গে মিশে যেতে চায়।

প্রধান অতিথি এসেছেন শোনা মাত্রই সবার মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। মাইকে বার বার ঘোষণা হচ্ছে তার কথা। তাকে ধরে ধীরে ধীরে মঞ্চে ওঠানো হচ্ছে। বয়সের ভারে ক্লান্ত, কিছুটা ঝুঁকে আসা ধবধবে ফর্সা রঙের এই মানুষটিকে দেখে খোকার ভেতরে কেমন যেন একটা শিহরণ খেলে যায়। খোকার শিরদাঁড়া সোজা হয়ে ওঠে। সে যেন কেমন মন্ত্রমুগ্ধের মতো হয়ে যায়। প্রধান অতিথি মঞ্চে ওঠামাত্র ঘোষণা এল, তোমরা সবাই দাঁড়িয়ে কবিকে সম্মান জানাও। তিনি আমাদের সবার প্রিয় কবি। দেশের সবচেয়ে বড়ো কবি। আমাদের স্বাধীনতার কবি।

হলরুমের সবাই মুহূর্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ল। পিনপতন নীরবতা। খোকার চোখের সামনে কবি যেন আরও বড়ো হয়ে উঠতে লাগলেন। এমন আগুনের মতো রঙঅলা মানুষ এর আগে খোকা আর কখনও দেখেনি। কবির শরীর কী আগুনে পোড়া? কবি কী মানুষ, না পরী, খোকার খুব জানতে ইচ্ছে হয়। জমকালো রং বাহারি ফতুয়া পরাতে কবিকে খুব সুপুরুষ লাগছে। কবি যেন রবিঠাকুরের সেই 'বীরপুরুষ'। কবির চুলের ভাজে ভাজে যেন মেঘের সাম্রাজ্য। চোখে পুরু চশমা।

কবি তার চেয়ারে বসলেন। গ্লাস থেকে পানি খেলেন। অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। কবি গভীর অভিনিবেশ সহকারে হলরুমে বসে থাকা ছাত্রছাত্রীদের দেখছেন। খোকা খুব মনোযোগ দিয়ে কবিকে খেয়াল করছে। চিলেকোঠার সেই নির্জন ঘরে বড়ো কাকার কাছে কত দিন এই কবির গল্প শুনেছে খোকা।

খোকা আজ সেই কবিকে তার চোখের সামনে থেকে দেখছে। সে তন্ময় হয়ে কবিকে শুধু দেখছে। খোকাকে একটু গুতো মেরে ছক্কা বলল, কী রে অমন করে কী দেখছিস?

খোকা চমকে ওঠে।

মাইকে ঘোষিত হয়, এবার প্রধান অতিথি বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করবেন। সেই সঙ্গে তিনি তার বক্তব্যও রাখবেন। কবি হেঁটে হেঁটে ডায়াসের কাছে এসে হাতের কনুইয়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর তার বক্তব্য শুরু করলেন। বললেন, তোমাদের বয়সি ছেলেমেয়েদের কাছে যখন আমি যাই তখন আমি আমার হারিয়ে যাওয়া কৈশোরকে খুঁজে পাই। পুরোনো ঢাকার ছেলে আমি। খুব চঞ্চল ছিলাম আমি ছোটোবেলায়। পড়াশোনার চেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে বেশি ভালো লাগত আমার। আজও ইচ্ছে করে বংশাল, মাহুতটুলী, আওলাদ হোসেন লেন, নবাববাড়ি, সদরঘাট, ইসলামপুর, জিন্দাবাহার লেন চষে বেড়াই। পুরোনো ঢাকার সবকিছুই আমার ভালো লাগে। আজ এই অনুষ্ঠানে আমাকে একটা কঠিন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। 'বড়ো কবি কে' তা নির্বাচন করার দায়িত্ব বর্তেছে আমার কাঁধে। তোমরা অত্যন্ত সুন্দর ভাষায়, যুক্তি দিয়ে, উপমা দিয়ে তোমাদের সপক্ষে রচনা লিখেছ। আমি বিস্মিত হয়েছি তোমাদের ভাষাশৈলী দেখে। আমাদের সময়ে আমরা বোধহয় এতটা সুন্দর করে গুছিয়ে লিখতে পারতাম না। যেটা তোমরা দক্ষতার সঙ্গে পেরেছ। এরও একটা কারণ বোধ করি আছে। আমরা ছিলাম পরাধীন দেশের মানুষ। তখন সময়টাও ছিল পরাধীন। বদ্ধ। আর তোমরা স্বাধীন দেশে উন্মুক্ত সময়ে বসবাস করছ। তোমরা মনে রাখবে সময়ই মানুষকে বদলে দেয়।

একটু থেমে কবি বললেন, 'কে বড়ো কবি' বিষয়টি নিয়ে খুব গভীরভাবে চিন্তা করে তোমরা রচনা লিখেছ। তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ী হয়েছ তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই আর যারা বিজয়ী হতে পারনি তাদেরকেও অভিনন্দন। জয়ী হওয়া বা পুরস্কার অর্জন বড়ো কথা নয়। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো– তুমি নিজেকে কতটুকু জানতে পেরেছ। তোমার মধ্যে দেশপ্রেম আছে কি না? দেশের প্রতি তুমি দায়বদ্ধ কি না?

কবি বলে চলেছেন, আজ আমি একজন অতি সাধারণ কবি হয়ে তোমাদেরকে একজন অনন্য সাধারণ বড়োমাপের কবির গল্প শোনাবো। তিনি হলেন হাজার বছরের সেরা বাঙালি। সারাজীবনে তিনি একটি মাত্র কবিতা লিখেছিলেন। কবে, কোথায় তিনি সেই কবিতাটি লিখেছিলেন তোমরা কি তা কেউ বলতে পারবে?

হলরুমের সবার মাঝে কবি তার প্রশ্নের জবাব জানতে চাইলেন। এবার হলরুমে যেন 'অশ্রুপতন' নীরবতা। কেউ জবাব দিতে পারল না। সবাই অপলক চোখে কবিকে দেখছে।

এবার কবি বললেন, তোমরা কেউ পারলে না। এটা তোমাদের জানার কথাও নয়, কারণ কখনও কেউ তোমাদের তা বলেনি। সত্য ইতিহাস আজ তোমাদের জানতে হবে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে বাঙালির সেরা কবি দুই লাইনের একটি কবিতা লিখেছিলেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম/এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এই এক কবিতাকে হৃদয়ে ধারণ করে আমরা দেশ স্বাধীন করেছি। এতটুকু বলার পর কবি অনেকক্ষণ আর কিছু বলতে পারলেন না। চুপ করে থাকলেন। মঞ্চে যারা বসে আছেন তারা যেন প্রচণ্ড শোকে নিথর হয়ে গেছেন। কারও মুখে কোনো কথা নেই। তারপর কবি বাক্‌রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, এই এক কবির জন্যই আমরা বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে পেয়েছি আর পৃথিবীতে নিজেদেরকে বুক ফুলিয়ে বাঙালি জাতি হিসেবে পরিচিত করতে পেরেছি। আচ্ছা তোমরাই বলো, এতকিছুর পরও আমি উনার চেয়ে বড়ো কবি আর কাকে মানবো। একথা বলতে বলতে কবি চোখ থেকে চশমা নামালেন। এ কী! কবি কাঁদছেন। কবির অশ্রুসিক্ত কথায় মঞ্চে বসে থাকা শিক্ষকরা সব বাচ্চাদের মতো হু হু করে কেঁদে উঠলেন। তাদের দেখাদেখি হলরুমে সবার চোখে অশ্রুবিন্দু ছলছল করছে। আর সেই ছলছলে অশ্রুবিন্দু চোখে নিয়ে খোকা মঞ্চের পেছনে পর্দায় আবিষ্কার করে এক বীরপুরুষকে। লাল সূর্য ভেদ করে খোকার কাছে ক্রমান্বয়ে বড়ো হয়ে উঠতে থাকে সেই সিংহপুরুষ।

দূর করো মন্দ, অবিশ্বাস

হাসান হাফিজ

তুমি স্নিগ্ধ সোঁদামাটি
তুমি সুপ্তি বীজধান
ঝড়ের ঝাপটার মতো অস্থিরতা
আকুলব্যাকুল আর্তি প্রলয়ের
সুন্দরের মর্ম আহ্বান।

তুমি নতুনের দোলা
নতুন বরষে হর্ষ
ফসলের মায়াস্পর্শ
জীবনের নতুন প্রত্যয়
তুমি রুদ্র বৈশাখের শঙ্খধ্বনি
দূর করো অবিশ্বাস
ঝেটিয়ে তাড়াও মন্দ
অশুভের রাহুগ্রাস
মনোমাঝে উঁকি দেয়া
দ্বিধান্বিত জড়তা সংশয়।

বৈশাখের শৈশব পোড়া স্মৃতি

অর্ণব আশিক

শৈশবের আকাশে জ্বলজ্বল করে
বৈশাখের রাঙা বিকেল,
ঝোলে ভো-কাট্টা ঘুড়ি, শুভ হালখাতা,
ইলিশ-পান্তার ঘ্রাণ ভোরের বাতাসে মৌ মৌ।

কৈশোরের সুতোর লাটাইতে বৈশাখ এক নির্মল দুঃখ
রঙিন বেলুন, নাগরদোলা, রঙিন ঘুড়ি
মারবেলের ঠোকাঠুকিতে সোনা রোদের গান
সংক্রান্তির দুপুরে পুকুরের ঘোলা জলে সাঁতার
বুকের গহীনে শৈশব হৃৎস্পন্দন
দাড়িয়াবান্ধা, লাটিম খেলা, বৈশাখি মেলা
হারিয়ে যাওয়া নুড়ির মতন।

বৈশাখ এখন শহুরে কালচার
সরকারি অনুষ্ঠানে পান্তা-ইলিশ
হারানো স্মৃতি হারানো সুখ
আবহমান বাংলার।

আমার সে গ্রাম কোথা
কোথা সে বৈশাখের রাঙা সুখ?

বৈশাখি আকাশজুড়ে

লিলি হক

বৈশাখি কোনো এক জ্যোৎস্না রাতে
হৃদয় কপাট খুলে
দু'হাত বাড়িয়ে ব্যাকুল প্রতীক্ষায় ছিলাম
যোগ্য এক কবিতার জন্য।

চাষাবাদের উপযোগী মাটিতে
যেমন প্রয়োজন যথার্থ চাষির
তেমনি একজন কবির জন্য
সম্পূর্ণ রুচিশীল পৌরুষ!
যার সাহসী আশ্রয়ে
খরাপীড়িত একটি জীবন হতে পারে
শাখা-প্রশাখাময় বিরাট মহিরুহ।

বৈশাখের নীরব গভীর রাতে
বুকের জমিতে লালন করেছিলাম
কী এক আবেগাপ্লুত প্রত্যাশা
এক সম্ভাবনাময় কিছু পঙক্তির জন্য
যে পঙক্তি আমার ছোট্টো পৃথিবীর
বৈশাখি আকাশজুড়ে
শতাব্দীর সুখ নববর্ষের আনন্দে
ভরিয়ে দেবে সুরে সুরে।

আজ বৈশাখে

বোরহান মাসুদ

আজ বোশেখে ছুটি আমার। নেই তো পড়ার বই
সারা বাড়ি সারা ঘরে আনন্দ হইচই।
ছুটে বেড়াই নতুন পাড়ায়, যেখানটাতে হাট
একটা ঘুড়ি কিনে আবার যাচ্ছি খেলার মাঠ।

ঘুড়িটাকে দূর আকাশে দিলাম ছেড়ে যেই
অমনি ঘুড়ি উড়ে বেড়ায় দূরের আকাশেই।
মাঠটা ছেড়ে ছুটি আবার পাতার বাঁশি নিয়ে
বাঁশের বাঁশি বাজাই শুধু একটানা সুর দিয়ে।

আসলো যখন স্বর্ণরাঙা ফুল ফোটানো ভোর
লাল ফড়িঙের দেখতে নাচন দেই যে খুলে দোর।
ঘুঘু যখন ডেকে ওঠে; ইচ্ছে ঘুঘু হই
গাছের ডালে পাতার ফাঁকে চুপটি বসে রই।

এমনি করে দিন কেটে যায় ফিরে আসে সাঁঝ
পুলক মনে থাকাই যেন আজকে আমার কাজ।
আজ বোশেখে সবার ঘরে হাসিখুশির ধুম
সেই আনন্দে হয় না আমার একটুখানি ঘুম।

আনন্দোৎসব

অদ্বৈত মারুত

আকাশে ছড়ানো ছিটানো মেঘেদের মধ্যে এখন উৎসব
উৎসব ভাব– গুড়গুড় আর গুঁতোগুঁতি করে প্রেম নিবেদন শেষে
কাছে আসতে ডাকে, একসাথে হলে দুজন কেঁদেকেটে হয়ে পড়ে
অস্থির, ঝরায় বারিপাত– তুমি তেমনই; তাপে-উত্তাপে সংশয়ে
খুলে দাও নয়নের বাঁধ।

জলের মোকামে শুধুই কি থাকে জল? খলবল করে ওঠে
বউমাছগুলো; তার ভাঁজে ভাঁজে রোদ পুরো এক বিকেলের মতো
যেমন থাকে তাগড়া, স্থূল; এই বর্ষায় উষ্ণতায় অধরের করিডরে
তুমিও যেন একফালি চাঁদ, শীতল আঁধার কেটে নির্মেদে ছড়িয়ে
দাও এক ঝিঁঝি ধরা ফাঁদ। শুধু ধীবরী নও, বাতাবিলেবুর মতো
টসটসে রসালো যমুনা নদী– দুর্গম পাহাড় থেকে তুমি পড়ো
আছড়ে, বুকের গভীরে; হৃদয়-সংঘাত প্রতিরোধী।

থাক এইসব গুপ্ত রহস্য; দেহের আনাচে-কানাচে আঙুরলতা
লকলক করে উঠছে, উঠুক বেড়ে সমুদয় প্রেম-মাদকতা
প্রগাঢ়তায় দিনযাপন শুধু আমাদের; তুমি তিলোত্তমা, মুগ্ধ করো
বারিপাত করো সর্বকলায়; অনন্ত, অসীম তুমি পারঙ্গমায় চৈত্র-
তপ্তদিন শীতল করো আনন্দোৎসবে...

স্বাগত পহেলা বৈশাখ

ম. মীজানুর রহমান

বাংলা বৈশাখ মাসের প্রথম দিন, তোমাকে স্মরণ করি।
হে পহেলা বৈশাখ, আজ তোমাকে সাদরে বরণ করি।
তুমি আমাদের জাতীয় মাসের পহেলা তারিখ,
তাই তুমি সকল বাঙালিরই অহংকার– বড়ো আন্তরিক।
আজ আমাদের জাতীয় চেতনায় আসুক শুধু প্রেম আর প্রীতি,
আর সমাজ দেহ থেকে মুছে যাক সব ভয় আর ভীতি।
আমাদের ঘরে ঘরে আজ থেকে ভরে যাক
আশার ভাষা, জনগণ-কল্যাণ।
জীবনের ভাষা, মানুষে মানুষে থাক
শুধু সৃষ্টি সুখের গান।
কোনোক্রমেই আর শত্রুতা নয়, সর্বত্র থাক
শুধু মানুষের মনে মানবিক কল্যাণ।
তবু আমরা করি না ভয় আকাশের কালো মেঘ দেখে
ভয় করি না'ক বজ্রবৃষ্টি ঝড়ো হাওয়ার
অশুভ সংকেত থেকে।
আমরা বীর জাতি তাই জানি না ভয় বলে কাকে।
আমরা শিখেছি সকল দুর্গতি
দুর্বিপাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে।
আমাদের পতাকায় আছে প্রজ্বলিত সূর্য আর সবুজ শান্তি
আর আছে অমিত শক্তি-সাহস, নাই কোনো অযথা ক্লান্তি।
তাই সূর্য-লাল রক্ত ঝরায়ে আমরা পারি মরতে।
আমাদের জাতিসত্তার তাই এত অহংকার
সত্য-ন্যায়ের অধিকার আদায়ে করি না ভয় তাই
এখানে-ওখানে সর্বত্র আমরা এক শক্ত হাতিয়ার।

এলো বৈশাখ

রকিবুল ইসলাম

আনন্দ মেলা হয়
বানরের খেলা হয়
আরও বাজে চারদিক ঢোল আর ঢাক
এলো বুঝি এলো রে, এলো বৈশাখ।

নবখাতা খোলা হয়
নাগরের দোলা হয়
মেঘে মেঘে বাজে আরও বিজলির ডাক
এলো বুঝি এলো রে, এলো বৈশাখ।

গাছে কুঁড়ি পাতা হয়
আরও হালখাতা হয়
পুরাতন জীর্ণতা ধুয়ে মুছে যাক
এলো বুঝি এলো রে, এলো বৈশাখ।

কালমেঘে ঝড় হয়
খুব বেশি ডর হয়
মাঠজুড়ে রোদ্দুর জ্বলে পুড়ে খাক
এলো বুঝি এলো রে, এলো বৈশাখ।

প্রকৃতির সাজ হয়
নানা কারুকাজ হয়।
উৎসবে উল্লাসে মেতে আজ থাক
এলো বুঝি এলো রে, এলো বৈশাখ।

বাংলায় এলো নববর্ষ

সুবর্ণা অধিকারী

চৈত্রের দাবদহ পেরিয়ে
বাংলায় এলো নববর্ষ
আনন্দ উৎসব ঘরে ঘরে
বাঙালির মনে জাগে হর্ষ।

আধপাকা আম ঝরে রৌদ্রে
সাথে ঝরে কচি পাতা
পুরানো হিসাবটা চুকিয়ে
গদিঘরে হবে হালখাতা।

বটতলা হাটখোলা ছড়িয়ে
উদ্যান পার্কে আনন্দ
মরমি সুর তোলা বাউলের
ঢাক ঢোল একতারা ছন্দ।

অন্যায় অন্ধ স্বার্থ ভুলে
পুরোনো বছরের কষ্ট
হাতে হাত রেখে প্রত্যয়
সংকটে নয় পথভ্রষ্ট।

চির উন্নত শিখর শির

হাসান আলীম

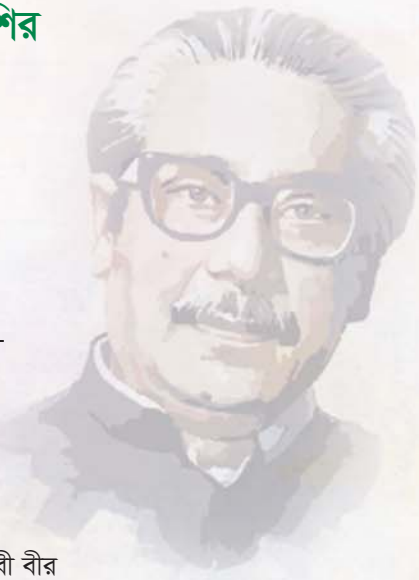

গোপালগঞ্জের
টুঙ্গিপাড়া দিচ্ছে সাড়া–
একটি ছেলে জন্ম নিতেই
নজরকাড়া!

যেই ছেলেটি জন্ম নিয়ে
তাঁর ঘরে,
ভালোবাসে নিজের চেয়েও–
দেশটাকে খুব আপন করে।

এই দেশটা করলো স্বাধীন
নাম রাখলো বাংলাদেশ,
সেই ছেলেটি শেখ মুজিবুর
ভালোবাসা অনিঃশেষ।

এই ছেলেটি বিশ্বসেরা বিপ্লবী বীর
এই ছেলেটি চির উন্নত
শিখর শির।

সেই ছেলেটি নয় তো শুধু জাতির পিতা,
সেই ছেলেটি সব মানুষের মনের মিতা।
সেই ছেলেটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান,
তাঁর কথা কি যায় রে ভোলা
যায় ভোলা তাঁর অবদান।

এই বৈশাখে

মিয়াজান কবীর

ওগো আমার খেলার সাথি, ওগো আমার সই,
তুমি থাকো শহর ঢাকায়– আমি গ্রামে রই।
পহেলা এই বৈশাখে দিলাম তোমায় দাওয়াত,
আদাঝালের খাওয়াবো ইলিশ-পান্তাভাত।
পান্তাভাতে দেবো আরও কৈ জিওল মাগুর
মজা করে খাবে যে তেলে ভাজা পাকুর।
পাটসাপটা পিঠে দেবো– দেবো দুধের সর,
খাবার শেষে খেতে দেবো পানসুপারি খর।
পানসুপারি খেয়ে তোমার রাঙা হবে মুখ,
মনে তোমার রং ছড়াবে পাবে পরম সুখ।
দাওয়াত তোমায় দিলাম সই নানান কথায় পত্রে,
তোমার কাছে লিখলাম পত্র– কাব্যগাথার ছত্রে।
ইতির আগে নিয় প্রীতি– নিও ভালোবাসা,
আসবে তুমি এই বৈশাখে প্রাণে জাগে আশা।
ঘুরবো সবে উল্লাসে বৈশাখি এই মেলায়,
উঠব মেতে ছোটোবেলার আনন্দ খেলায়।
মেলা থেকে দেবো কিনে মজাদার কুরমুড়,
এসো তুমি আমার গাঁয়ের বাড়ি আমছিমুর।

কালের মহান পুত্র

শাফিকুর রাহী

হাজার যুগের কাঙ্ক্ষিত এক স্মৃতির মিনার গড়তে
ত্যাগের বিরল বীর মহিমায় জাগ্রত হয় লড়তে।
বিশ্বসেরা কোন মহাবীর; কালের মহান পুত্র;
আপন আবাস গড়ার স্বপ্নে খোঁজেন নতুন সূত্র!
হয় আগোয়ান লক্ষ জোয়ান আঘাত হেনে দ্বারে–
মেঘলাকাশে নাও ভাসালেন গভীর অন্ধকারে।

কে জ্বালালো দীপ্ত মশাল স্বাধীনতা আনতে;
বীর বাঙালির অধিকারটা বাধ্য করে মানতে!
দুঃশাসনের পাষাণ প্রাচীর ভাঙার অঙ্গীকারে
বীর বাঙালির পরম আপন–বন্দি কারাগারে।
গাঁওগেরামে দেশ-বিদেশে বীরের শপথ পাঠে–
জাগলো মানুষ বীর গেরিলা জ্বালতে আলো মাঠে।

কে ওড়ালো আলোর নিশান; মুক্ত বাতাস কিনতে;
বিশ্বজয়ী সেই নেতাকে তোমরা সবাই চিনতে!
নিজের সকল সাধ-আহ্লাদ ত্যাজ্য করেন যিনি
বুকের ভেতর আগলে রাখেন দেশ-জাতিকে তিনি।
নিঃস্বার্থ যাঁর কর্মকাণ্ডে বিশ্ব অবাক হয়
লাখো প্রাণের আত্মদানে জয় বাংলার জয়।

আঁধার ভাঙার গান শোনালেন কোন সে মহান রাজা!
তাঁর নামেতে জারি সারি ভাটিয়ালি বাজা।
তাঁর কাছে এই বীর বাঙালির চিরকালের ঋণ
তাঁর আদর্শে গড়বো স্বদেশ আমরা চিরদিন।
তিনি জাতির আশার ভাষা– গড়তে আগামী
তাঁর চেতনায় উদ্ধত শির আমরা উদ্যমী ।

মহাবীরের অমরগাথা জন্মদিনের গানে,
শ্রদ্ধাভরে করব স্মরণ আনন্দ উদ্যানে।
সুবর্ণ জয়ন্তী আজকে আমরা পালন করব
মাতৃভূমির জন্যে আমরা জীবন দিয়ে লড়বো।
বীরত্বেরই বীর মহিমায় নানা রঙের খেলায়
দূর নীলিমায় সুনীল প্রভায় ভাসবো হাওয়ার ভেলায়।

গল্পটা বোশেখের

খান চমন-ই-এলাহি

বোশেখের গল্পটা তার মনে নেই; এখন আর
কৈশোর কিংবা যৌবন তার স্মৃতির অনুষঙ্গ নয়
ঝড় এসে নিয়ে গেছে সুখ-সুখ রমনাগ্রিন বিকেল
স্বপ্নের কর্ষিত সবুজাভ কামনাসিক্ত মাঠ
ঘাঘরের নৌকা বাইচ, বটতলা, পাড়কোণা, গঞ্জের মেলা!

বোশেখের গল্পটা তার কাছে এখন– লালখাতা, হালখাতা
নতুন সংসারে অঢেল বিত্ত-বৈভব, টাকা-গাড়ি-বাড়ি
অকারণ হাসাহাসি, কৃত্রিম বাসনার ভালোবাসাবাসি।

গল্পটা বোশেখের, উৎসব মানুষের–
কেউ কেউ আমোদে বর্ষবরণ করে
আবার কারও বুকে নিঃসঙ্গতায় অশ্রু-প্রপাত নামে!

ঈদের এদিন

আ.শ.ম. বাবর আলী

মনটা যে হয় প্রজাপতি ঈদের এদিন এলে,
ঘুরে ফিরে নাচতে থাকি রঙিন পাখা মেলে।
পায়রা হয়ে খুশিতে মন বাকুম বাকুম ডাকে,
সুবাস ভরে রাখি বুকে গোলাপ যেমন রাখে।
মনের মধ্যে ইচ্ছা জাগে হাওয়ায় ভেসে উড়ি,
আনন্দেতে উচ্চে উঠি হয়ে রঙিন ঘুড়ি।
ঈদের দিনে মনটা যে চায় হতে বাবুই পাখি,
দেশটা যে তার বাসার মতো নিরাপদ বাস রাখি।

এইদিনে তো হই যে আমি ভোমরা ফুলের বনে,
চারদিকেতে মাতিয়ে তুলি আনন্দ গুঞ্জনে।
ঈদের দিনে এমনি আরো হই যে কত কী যে,
খুশির মেলায় হারিয়ে ফেলি নিজকে আমি নিজে।

বন্ধুরা কই?

সাঈদ তপু

বন্ধুরা কই? নেইকো তেমন
কারোর কোনোই সাড়া
ঈদ এলো আজ ঘনিয়ে দ্বারে
নীরব কেনো পাড়া?

নেই কেনো আর ছোট্টবেলার
সেই মিলনের সুর?
এক পাড়াতে থেকেও সবাই
মনের ভীষণ দূর!

কোথায় গেলো দিনগুলো সেই
তেঁতুল পাতার ঘর?
সব ভেদাভেদ ভুলে সবাই
ছিল আপন পর!

হঠাৎ মনের কী হলো আজ
তুললো ক্ষয়ের দেয়াল
কারোর প্রতি তেমন কোনো
রাখি না আর খেয়াল

নিজকে নিয়েই চিন্তা ভীষণ
নিজের কথাই ভাবি
আত্মকেন্দ্রিকতায় খুঁজি
সফলতার চাবি

নিজের ভালো মানেই শুধু
ভালো থাকা নয়
বন্ধু-স্বজন মিলেমিশেই
ভালো থাকতে হয়।

ঈদ তো বিধাতার দান

শাহীন খান

ঈদ তো বিধাতার দান, সে তো দান
বয়ে যায় দুনিয়াতে খুশি অফুরান।

মুমিনের কাছে সে তো চোখের মণি
বুক ভরা ভালোবাসা সোনার খনি।

সুরভিতে ঢাকা থাকে চারদিক সব
বয়ে যায় সুধাময় প্রীতি উৎসব।

মন প্রাণ কেড়ে নেয় মধুময় ঈদ
পুলকিত হয়ে পড়ে সকলেরই হৃদ।

ঈদ তো মায়াবী স্বপ্ন রঙিন
সুখ সুখ খুব সুখ বাজে বুকে বিন।

মৌ মৌ কলরব হইচই ক্ষণ
দুটি চোখে বয়ে যায় কী যে আলোড়ন।

নতুন জামা-প্যান্ট-টুপি পরা
ঈদগাহে চলে যাওয়া নামাজ পড়া।

বাড়ি বাড়ি খাওয়াদাওয়া ধুম পড়ে ধুম
মনে আসে ছন্দ রুমঝুমাঝুম।

ঈদের খুশি

রাজীব হাসান

খুশির জোয়ার বইছে ঘরে
ঈদ এসেছে ঈদ
নতুন জামায় খোকাখুকির
উড়ে গেছে নিদ।

আতশবাজির ঝলকানিতে
রাত হয়েছে দিন
ঈদ এসেছে ঈদ এসেছে
বইছে খুশির বিন।

ঐ যে দেখো চাঁদ উঠেছে
গগন মাঝে ঐ
খোকাখুকি নাচে দেখো
হই হুল্লোড় হই।

সাজবে সবাই ঈদের দিনে
নতুন নতুন সাজ
কেউবা আবার করবে বসে
হরেক রকম কাজ।

বর্ণাঢ্য বিদায় সদ্য সাবেক রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের

টানা দুই মেয়াদে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ১০ বছর ৪১ দিন কাটিয়ে অবসরে যান সদ্য সাবেক রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। ২৪শে এপ্রিল বঙ্গভবনের পক্ষ থেকে রাজসিক বিদায় জানানো হয় মোঃ আবদুল হামিদকে। এ সময় তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের ৫২ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো রাষ্ট্রপ্রধানকে রাষ্ট্রীয় বিদায় জানালো বঙ্গভবন। আনুষ্ঠানিকতা শেষে মোটর শোভাযাত্রায় তাঁকে পৌঁছে দেওয়া হয় রাজধানীর নিকুঞ্জের 'রাষ্ট্রপতি লজে'।

প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও সংসদ সদস্য মোঃ আবদুল হামিদ পাঁচ বছর আগে ২০১৮ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে দেশের ২১তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন। এর আগে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমান সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় ২০১৩ সালের ১৪ই মার্চ প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন তিনি। জিল্লুর রহমানের মৃত্যুর পর ২০১৩ সালে ২০শে মার্চ তিনি ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হন। পরে মোঃ আবদুল হামিদ ২০১৩ সালের ২২শে এপ্রিল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। মোঃ আবদুল হামিদের ১৯৫৯ সালে ছাত্রলীগে যোগদানের মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবনের শুরু হয়। ১৯৬৯ সালের শেষদিকে তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দেন। তিনি নবম সংসদে স্পিকার নির্বাচিত হন এবং ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে তিনি ডেপুটি স্পিকার ছিলেন। উল্লেখ্য, মোঃ আবদুল হামিদ এর আগে ১৯৭১ সালে দেশের স্বাধীনতার পর থেকে সাতবার সংসদ সদস্য (এমপি) নির্বাচিত হন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪শে এপ্রিল ২০২৩ বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির শপথ অনুষ্ঠানে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বিদায়ি রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদকে। এসময় বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা উপস্থিত ছিলেন –পিআইডি

বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিলেন মোঃ সাহাবুদ্দিন

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ মোঃ সাহাবুদ্দিন ২৪শে এপ্রিল বঙ্গভবনের ঐতিহাসিক দরবার হলে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। সকাল ১১টায় রাষ্ট্রপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী, বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য এবং শতাধিক বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন। পরে মোঃ সাহাবুদ্দিন ও স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী শপথ নথিতে স্বাক্ষর করেন। রাষ্ট্রপতি শপথ গ্রহণের পর অতিথিদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

জাতির পিতার ১০৩তম জন্মবার্ষিকী

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, ১৭ই মার্চ বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ১৯২০ সালের এই দিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের কাদা-জল, মেঠোপথ আর প্রকৃতির খোলামেলা পরিবেশে বেড়ে ওঠা বঙ্গবন্ধু শৈশব থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদি কিন্তু অধিকার আদায়ে আপোশহীন। পরোপকার আর অন্যের দুঃখ-কষ্ট লাঘবে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। জীবনের প্রতিটি ক্ষণে যেখানেই অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নির্যাতন দেখেছেন, সেখানেই প্রতিবাদে নেমে পড়েছেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে ব্রিটিশবিরোধী সভা-সমাবেশে অংশ নেন তিনি। এছাড়া গরিব ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার খরচ চালাতে 'মুসলিম সেবা সমিতি' পরিচালনা করেন। চল্লিশের দশকে এই তরুণ-ছাত্রনেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সংস্পর্শে এসে সক্রিয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। ১৭ই মার্চ জাতির পিতার ১০৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে এসব কথা বলেন তিনি।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাঙালির আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'– যা ছিল মূলত স্বাধীনতার

ডাক। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ। এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু শুধু স্বাধীনতার ডাকই দেননি বরং মুক্তিযুদ্ধের রূপরেখা ও ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কেও দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর আক্রমণ চালালে ২৬শে মার্চ ১৯৭১ জাতির পিতা ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি অকুতোভয় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা'। দেশ ও জনগণের প্রতি তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য বাংলা, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু আজ এক ও অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতার পর পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে জাতির পিতা ১০ই জানুয়ারি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। দেশকে 'সোনার বাংলা' হিসেবে গড়ে তোলার সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তাঁকে সপরিবার হত্যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণ হতে দেয়নি। কিন্তু হায়েনার দল বুঝতে পারেনি জীবিত বঙ্গবন্ধুর চেয়ে লোকান্তরের বঙ্গবন্ধু অনেক বেশি শক্তিশালী।

বঙ্গভবনের দরবার হলে ২৪শে এপ্রিল ২০২৩ মোঃ সাহাবুদ্দিনকে ২২তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। এসময় বিদায়ি রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ উপস্থিত ছিলেন –পিআইডি

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে দেশ স্বাধীন হয়েছিল, অনেক চড়াই-উতরাই পার হয়ে সেই বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ। আজ সকল আশঙ্কা ও নেতিবাচক ভবিষ্যৎ বাণী ভুল প্রমাণ করে জাতির পিতার অসমাপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে চলেছেন তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আজ আমরা দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছি একটি উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অভিমুখে। রাষ্ট্রপতি বলেন, বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির চিরন্তন প্রেরণার উৎস। রাজনীতিতে তিনি নীতি ও আদর্শের প্রতীক। বাংলাদেশকে জানতে হলে বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে হবে, বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে জাতি এগিয়ে যাক ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পথে, নোঙ্গর ফেলুক বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলায়'। জয় বাংলা।

বিশ্ব পানি দিবস ২০২৩

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, বিশুদ্ধ, নিরাপদ ও সুপেয় পানি মানুষসহ বিশ্বের সকল প্রাণিকুলের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য। উৎস হতে সমুদ্র অবধি পানির অবারিত প্রবাহ ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেই পানির সুষম প্রাপ্যতা ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সম্ভব। নদীমাতৃক বাংলাদেশে মনুষ্যসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক নানাবিধ কারণে পানীয় জল ও স্যানিটেশনের সংকট বিদ্যমান। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার নদী ও খাল পুনঃখনন, প্রাকৃতিক জলাধার রক্ষণাবেক্ষণ এবং নতুন জলাধার ও ব্যারেজ নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এছাড়া নদীর তীর সংরক্ষণ, পানি অবকাঠামো সংস্কার করে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, ভূমি পুনরুদ্ধার, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার প্রচেষ্টা চলমান। স্থানীয় পর্যায়ে উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের জলাধারসমূহে বছরজুড়ে পানি সংরক্ষণ পরিকল্পনা এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত 'বিশ্ব পানি দিবস' উপলক্ষে ২২শে মার্চ বাণীতে এসব কথা বলেন তিনি। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য– 'Accelerating change to solve the water and sanitation crisis.'

প্রতিবেদন: মিতা খান

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

জনশক্তি পাঠানোর জন্য নতুন দেশ খুঁজে বের করতে হবে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের নতুন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র এবং নতুন দেশ (জনশক্তি পাঠানোর জন্য) খুঁজে বের করতে হবে। আমরা এমন ধরনের প্রশিক্ষণের (কর্মীদের জন্য) ব্যবস্থা করব যা একটি দেশের প্রয়োজন। ২রা এপ্রিল ২০২৩ তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে সূচনা বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। এ সময় তিনি দক্ষ

গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ৫ই এপ্রিল ২০২৩ নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণে সরকারি ঋণ পরিশোধের প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির চেক তুলে দেন সড়ক, পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের –পিআইডি

জনশক্তি পাঠানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বৈধ মাধ্যমে দেশে রেমিট্যান্স পাঠানোর আহ্বান জানান।

সরকার এরই মধ্যে কয়েকটি নতুন দেশে কর্মী পাঠানো শুরু করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের দক্ষ জনশক্তি পাঠাতে হবে এবং সেজন্য আমরা কর্মীদের জন্য বহুমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। যদি আমরা যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি পাঠাতে পারি, তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা অর্জনের বড়ো সুযোগ রয়েছে।

ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ঝামেলামুক্ত সেবা দানের নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জমির মালিকানা সংক্রান্ত সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যার অবসান এবং ঝামেলামুক্ত সেবা নিশ্চিত করতে ভূমি ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। ২৯শে মার্চ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (বিআইসিসি)-তে দেশের প্রথম তিন দিনব্যাপী জাতীয় ভূমি সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ভূমির মালিকানা সুনির্দিষ্ট করার জন্য ভূমি বণ্টন ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজ করতে হবে এবং এর ফলে পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনি দেশে এবং বিদেশে যেখানেই থাকুন না কেন– আপনার (দেশবাসী) সম্পত্তি আপনারই থাকবে। আমরা আপনার অধিকার সুরক্ষিত ও সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছি। জমি সংক্রান্ত পরিষেবা পাওয়ার সময় জনগণকে কিছুতেই ঝামেলার সম্মুখীন করা যাবে না উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা একটি ডিজিটাল ল্যান্ড সিস্টেম তৈরি করছি বলে সমস্যাটি আর থাকবে না। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সাতটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের সূচনা করে বলেন, আমাদের ভূমি মন্ত্রণালয়ের গৃহীত সাতটি উদ্যোগের প্রতিটি একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এগুলো হলো– লক্ষ্মীপুরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্মৃতিস্তম্ভ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গুচ্ছগ্রাম কমপ্লেক্স, রেজিস্ট্রেশন-মিউটেশন ইন্টারকানেকশন, স্মার্ট ল্যান্ড ম্যাপ, স্মার্ট ল্যান্ড রেকর্ডস, স্মার্ট ল্যান্ড পিডিয়া, স্মার্ট ল্যান্ড, সারা দেশে ৪০০ উপজেলায় সার্ভিস সেন্টার ও আধুনিক ভূমি অফিস।

সমুদ্র সম্পদ রক্ষায় নৌবাহিনীর আধুনিকায়ন করছে সরকার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে একটি আধুনিক, শক্তিশালী ও সক্ষম বাহিনী হিসেবে গঠনে বর্তমান সরকার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সমুদ্রের অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় নৌবাহিনীর আধুনিকায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষা ও দুর্যোগ মোকাবিলায় বঙ্গবন্ধু আধুনিক ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীর স্বপ্ন দেখেছিলেন। জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে একটি আধুনিক শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তুলতে সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এ বিশেষায়িত ঘাঁটি সংযোজিত হয়েছে। ২০শে মার্চ গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে কক্সবাজারে বানৌজা শেখ হাসিনা সাবমেরিন ঘাঁটির উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এসময় দেশের সার্বভৌমত্ব, সমুদ্রসীমার নিরাপত্তা রক্ষা ও চলমান অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য নৌবাহিনীর সদস্যদের কঠোর পরিশ্রম ও কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য ধন্যবাদ জানান তিনি।

ভিডিও টেলিকনফারেন্সে যুক্ত হওয়া প্রধানমন্ত্রীর অনুমতিক্রমে নৌবাহিনীপ্রধান অ্যাডমিরাল এম শাহীন ইকবাল ঘাঁটির অধিনায়ক কমোডর মোহাম্মদ আতিকুর রহমানের হাতে কমিশনিং ফরমান তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিক নামফলক উন্মোচন করেন। এর মধ্য দিয়ে ঘাঁটিতে নৌবাহিনীর অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু হয়।

দেশজুড়ে আরও ৫০টি মডেল মসজিদ উদ্বোধন

দেশজুড়ে আরও ৫০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৬ই মার্চ সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তৃতীয় ধাপে এসব মসজিদ উদ্বোধন করেন তিনি। তিন ধাপে সারা দেশে ৯ হাজার ৪৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিতব্য ৫৬৪টি মসজিদের মধ্যে ১৫০টি মসজিদ উদ্বোধন হয়। সরকারপ্রধান প্রথম দফায় ২০২১ সালের ১০ই জুন ৫০টি মসজিদ এবং চলতি বছর ১৬ই জানুয়ারি দ্বিতীয় দফায় আরও ৫০টি মডেল মসজিদ উদ্বোধন করেন। অবশিষ্ট মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নির্মাণ ২০২৪ সালের জুনে শেষ হবে।

মৈত্রী পাইপলাইন দুই দেশের সহযোগিতার উন্নয়নের মাইলফলক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী পাইপলাইন উদ্বোধনকে দুই বন্ধুপ্রতীম দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার একটি মাইলফলক অর্জন হিসেবে বর্ণনা করেন। ১৮ই মার্চ ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী পাইপলাইন উদ্বোধন শেষে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন

থেকে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারত থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বোতাম টিপে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী পাইপলাইন উদ্বোধন করেন।

ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিট (এলওসি) থেকে নেওয়া প্রায় ৩ দশমিক ৪৬ বিলিয়ন ভারতীয় রুপি ব্যয়ে নির্মিত ১৩১ দশমিক ৫ কিলোমিটার মৈত্রী পাইপলাইনের (আইবিএফপিএল) মাধ্যমে বাংলাদেশে ডিজেল রপ্তানি করবে ভারত। পাইপলাইন উদ্বোধনের পর উভয় প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, এটি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি পারস্পরিক সুবিধার জন্য দেশ দুটির মধ্যে কানেকটিভিটি বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার ওপরও তাঁরা জোর দেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, এটি বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধির পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করবে।

স্মার্ট বাংলাদেশে কেউ ভূমিহীন-গৃহহীন থাকবে না

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট নাগরিক প্রয়োজন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আজকের শিশুদের মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তারাই হবে স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট জনগোষ্ঠী। স্মার্ট বাংলাদেশে কোনো শিশুই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হবে না, কোনো মানুষই ভূমিহীন-গৃহহীন থাকবে না। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হবে না, সব মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে বাংলাদেশকে আমরা গড়ে তুলবো। ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জাতীয় শিশু দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য- 'স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন, শিশুদের চোখ সমৃদ্ধির স্বপ্নে রঙিন'।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

ঢাকায় তথ্য ভবন মিলনায়তনে ২৩শে মার্চ ২০২৩ জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট আয়োজিত সড়ক নিরাপত্তা রিপোর্টিং বিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের সাথে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ –পিআইডি

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়: বিশেষ প্রতিবেদন

৭ই মার্চ ছাড়া স্বাধীনতার ইতিহাস অসম্পূর্ণ

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, ৭ই মার্চের ভাষণ-জনসভাকে বাদ দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম হয় না, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয় না। বিশ্বের লিপিবদ্ধ ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই ভাষণ একটি দেশ বদলে দিয়েছে, পৃথিবীর মানচিত্রই বদলে দিয়েছে। যারা ৭ই মার্চ পালন করে না, অস্বীকার করে, তারা স্বাধীনতাকে কতটুকু স্বীকার করে, কতটুকু বিশ্বাস করে সেটিই হচ্ছে বড়ো প্রশ্ন। ৭ই মার্চ রাজধানীর কাকরাইলে তথ্য ভবনে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ' অনুষ্ঠানমালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। এদিন সকালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের শিখা চিরন্তন প্রাঙ্গণে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর এবং তথ্য অধিদফতর আয়োজিত আলোকচিত্র ও বই প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন সচিব হুমায়ুন কবীর খোন্দকার।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ৭ই মার্চকে অস্বীকার করে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম হয় না, অথচ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পরে বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ রাষ্ট্রীয় বেতার যন্ত্রে, টেলিভিশনে, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানমালায় বন্ধ ছিল, এমনকি ভাষণের সিডি সব জায়গা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, ধ্বংস করা হয়েছিল। নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ১৯৭৮, '৭৯, '৮০, '৮১ সালে ছাত্রলীগের নবীন কর্মী হিসেবে আমি চট্টগ্রাম শহরে জনসভার মাইকিং করতাম। কোনো গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে গেলে প্রথমে আমরা ৭ই মার্চের ভাষণ বাজিয়ে দিতাম, মানুষ জমে যেত। তারপর জনসভার কথা বলতাম।

তিনি বলেন, আজকে ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্ব ইতিহাসের একটি অনন্য প্রামাণ্য দলিল হিসেবে ইউনেসকো সংরক্ষণ করেছে, বিশ্ব স্বীকৃতি দিয়েছে। পৃথিবীতে অনেক কালজয়ী ভাষণ আছে। সেই কালজয়ী ভাষণগুলোর বেশিরভাগই যেমন নেলসন ম্যান্ডেলা, নেতাজি সুভাষ বসুর ভাষণ ছিল লিখিত। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণে আমরা দেখি কোনো দাঁড়ি-কমা-সেমিকোলন ছাড়া, কোনো ইতস্তত ভাব ছাড়া তিনি এক নাগাড়ে দাঁড়িয়ে সব কথা বলে গিয়েছেন এবং গণমানুষের ভাষায় কথা বলেছেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আরও বলেন, ১৯৭০ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা ছিল ১২ লাখ কয়েক হাজার। আর জনসভায় হাজির ছিল ১০ লাখ মানুষ। শহরের বেশিরভাগ মানুষ সেখানে চলে গিয়েছিল, আশপাশের জেলা থেকেও মানুষের সমাগম ঘটেছিল। এই ভাষণের মাধ্যমে একটি জাতির জন্ম হয়েছিল। একটি নিরস্ত্র জাতি, সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তরিত হয়ে এক সাগর রক্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনেছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে।

গত দশকে বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়ন বিশ্বে অনন্য

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারীসমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ওপর জোর দিয়েছেন বলেই আজকে আমাদের নারীরা পৃথিবীকে পথ দেখাচ্ছে। নারীর যে ক্ষমতায়ন বাংলাদেশে হয়েছে, পৃথিবীর আর কোনো দেশে গত এক দশকে এভাবে হয়নি। উপাত্ত তুলে ধরে তিনি বলেন, বৈশ্বিক সূচকে বাংলাদেশের নারীরা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দিক দিয়ে বিশ্বে পঞ্চম, এশিয়ায় দ্বিতীয় আর উপমহাদেশে প্রথম। শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বের কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে এবং দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারীর উন্নয়ন ব্যতীত দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্যই প্রধানমন্ত্রী নারীর অভাবনীয় ক্ষমতায়ন করেছেন। ১৮ই মার্চ ঢাকা থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলা যুব মহিলা লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে দেওয়া শুভেচ্ছা বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

এসময় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজকে নারীরা সেনাবাহিনীতে শুধু অফিসার পদে নয়, সেনা সদস্য হিসেবেও কাজ করছে। আজ তারা সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি, ডিসি, এসপি, যা ১৪ বছর আগে কেউ ভাবেনি। আমাদের নারীরা এভারেস্ট জয় করেছে, হিমালয় শৃঙ্গে উঠেছে, মহাসাগর পাড়ি দিচ্ছে। বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী নারী, বিরোধীদলীয় নেত্রী নারী, সংসদের স্পিকার নারী, সংসদ নেতা ও উপনেতাও নারী, শিক্ষামন্ত্রী নারী। নারীর উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জোর দিয়েছেন বলেই এসব সম্ভব হয়েছে।

চলচ্চিত্র সংসদ দেশকে স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছাতে অবদান রাখবে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, দেশকে জাতির পিতা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছাতে আমাদের চলচ্চিত্র অবদান রাখবে এবং চলচ্চিত্র সংসদ সেখানে নেতৃত্ব দেবে। ১৯শে মার্চ রাজধানীর সেগুনবাগিচায় শিল্পকলা একাডেমির নাট্যশালা মিলনায়তনে বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের ৬০ বছর ও ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ৫০ বছরপূর্তি উপলক্ষে বছরব্যাপী আয়োজন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে চলচ্চিত্র শিল্পের যাত্রা শুরু হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে ১৯৫৭ সালে ঢাকায় চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। সময়ের আবর্তে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চলচ্চিত্র শিল্প আজ ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের বহু চলচ্চিত্র অনেক আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে। গত বছরের শেষ দিকে কলকাতায় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসবে দুপুর একটায় বাংলাদেশের সিনেমা দেখার জন্য সকাল নয়টা থেকে এক মাইল লম্বা লাইন হয়েছে। আমাদের বন্ধ হয়ে যাওয়া সিনেমা হল চালু হচ্ছে, সিনেপ্লেক্সের সংখ্যা বাড়ছে। সিনেমা হল সংস্কার ও নির্মাণে এক হাজার কোটি টাকার সহজ ঋণ তহবিল গঠন করা হয়েছে। করোনায় সব থমকে না গেলে বাংলাদেশের সিনেমা শিল্প ইতোমধ্যে আরও এগিয়ে যেত উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আরও বলেন, আগামী এক বছরের মধ্যে চলচ্চিত্র শিল্প আরও দৃঢ় অবস্থানে আসবে এবং দেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্ব বাজারে আরও সমাদৃত হবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

ক্যাবল নেটওয়ার্ক ডিজিটাল হলে সবাই উপকৃত হবে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ক্যাবল নেটওয়ার্ক ডিজিটাল হলে দর্শক, অপারেটর, সরকার সবাই উপকৃত হবে। দর্শক বেশি চ্যানেল ও স্বচ্ছতর ছবি পাবে, অপারেটররা ব্যাবসার ঠিক হিসাব এবং সরকার ঠিক রাজস্ব পাবে। একইসঙ্গে এজন্য প্রয়োজনীয় সেট টপ বক্সগুলো যেন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ সকলের সামর্থ্য অনুযায়ী কেনার সুযোগ থাকে সে বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। ২৮শে মার্চ রাজধানীর কাকরাইলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ক্যাবল অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব) আয়োজিত ইফতার সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

দেশের ক্যাবল নেটওয়ার্ককে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তরের পথিকৃৎ ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, আমরা একেকটি এলাকা ব্লক করে নেটওয়ার্ক ডিজিটাল করাতে চাই না। ডিজিটাল করার প্রক্রিয়ার শুরুতে এনালগ পদ্ধতিও পাশাপাশি থাকতে পারে। তবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে দেশি-বিদেশি সকল চ্যানেল আর এনালগ পদ্ধতিতে শুধু দেশি চ্যানেল দেখা যাবে।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

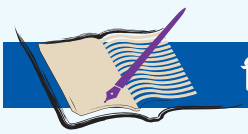

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

সব বিশ্ববিদ্যালয়ে একক ভর্তি পরীক্ষা আগামী বছর থেকে

আগামী ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলাদেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে শুধু একটি ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন– ইউজিসি। এলক্ষ্যে বড়ো ও পুরোনো পাঁচ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির উপস্থিতিতে ৩রা এপ্রিল বৈঠক করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে আগারগাঁওয়ের ইউজিসি ভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে একক ভর্তি পরীক্ষা নিতে একমত হয় সব বিশ্ববিদ্যালয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, একবার নয়, বছরে অন্তত দুবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে। এ প্রক্রিয়াকে কার্যকর করতে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ন্যাশনাল টেস্টিং অথরিটি (এনটিএ) নামে আলাদা কর্তৃপক্ষ গঠনেরও পরিকল্পনা করা হচ্ছে। সেখানে ইউজিসির কর্মকর্তাসহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও জ্যেষ্ঠ শিক্ষকরা থাকবেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।

বদলে যাচ্ছে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি

মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন চলছে। নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী, ২০২৩ সালে এই দুই শ্রেণির পরীক্ষা আর প্রচলিত পদ্ধতিতে হবে না। এর বদলে চালু হচ্ছে নতুন শিখন-শেখানো কার্যক্রম। শিক্ষার্থীদের প্রথম ও দ্বিতীয় সাময়িক এবং বার্ষিক পরীক্ষার বদলে ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন (পরীক্ষা) পদ্ধতি চালু হচ্ছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের এই ধারাবাহিকতায় এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা জারি করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর। ১৩ই

মার্চ সকল আঞ্চলিক পরিচালককে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা দেওয়া হয়।

রমজানে স্কুল-কলেজ বন্ধ, প্রাথমিকে ১৫ দিন ক্লাস

এ বছর রমজান মাসের শুরু থেকেই মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের ছুটির তালিকা অনুযায়ী, ২৩শে মার্চ থেকে সরকারি-বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রমজানের ছুটি শুরু হয়। ঈদুল ফিতরের ছুটিসহ মোট এক মাস পাঁচদিন এই ছুটি চলবে। ২৭শে এপ্রিল সারা দেশে এ স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলবে। এই সময়ের মধ্যে ইস্টার সানডে, চৈত্রসংক্রান্তি, বাংলা নববর্ষ, জুমাতুল বিদা, স্বাধীনতা দিবস ও ঈদুল ফিতরের ছুটিও থাকছে। কলেজ ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলোতেও ছুটি শুরু হয় ২৩শে মার্চ থেকে। আর মাদ্রাসায় রোজার ছুটি শুরু হয় ২২শে মার্চ থেকে।

২০শে মার্চ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নেহাল আহমেদ জানান, বছরের শুরুতেই ছুটির তালিকা স্কুলগুলোতে পাঠিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছুটি শুরু হয় ৭ই এপ্রিল থেকে। ছুটি চলবে ২৭শে এপ্রিল পর্যন্ত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছুটি শুরু হয় ২৩শে মার্চ থেকে।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

ডিজিটাল বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট পাবে ৫১টি স্টার্টআপ

উদ্যোক্তা ও স্টার্টআপদের জন্য আবারও চালু হলো বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ)। ২০২৩ সালের বিগ উপলক্ষে ২৮শে মার্চ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আইসিটি টাওয়ারের বিসিসি অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্টের মাধ্যমে আমাদের তরুণ উদ্ভাবকেরা শুধু দেশের নয় বিশ্বের সমস্যাও সমাধান করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রতিমন্ত্রী আরও জানান, ভারত-সিঙ্গাপুর থেকে এরই মধ্যে বাংলাদেশের স্টার্টআপগুলোতে ৮০০ মিলিয়নের ওপর বিনিয়োগ এসেছে। প্রাথমিকভাবে ২৮শে মার্চ থেকে বিগ ২০২৩-এর নির্ধারিত ওয়েবসাইটে (www.big.gov.bd) ভিজিট করে নিবন্ধন করা যাবে। জাতীয় পর্যায়ে ২২শে এপ্রিলের মধ্যে যে-কোনো তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক উদ্যোক্তা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট-এর পুরস্কার হিসেবে সেরা একটি স্টার্টআপকে দেওয়া হবে বিশেষ সম্মাননা এবং গ্র্যান্ট হিসেবে ১ কোটি টাকা অনুদান। বাকি নির্বাচিত তালিকার সেরা ৫০টি স্টার্টআপের প্রত্যেককে দেওয়া হবে ১০ লাখ টাকা করে অনুদান।

তরুণ উদ্যোক্তারা চাকরি না খুঁজে চাকরিদাতা হবেন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে মেধানির্ভর অর্থনীতির দেশ। তিনি বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশের ডিজিটাল অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দুয়ার খুলতে শিক্ষাবিদদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার, ব্যবসায়ী এবং একাডেমির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ১২ই মার্চ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ বিজনেস সামিটে এক আলোচনায় অংশ নিয়ে বিশেষ অতিথি হিসেবে প্লানারি সেশনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী দেশে ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরির সুফলের বিষয় তুলে ধরে বলেন, বিকাশ এখন মোবাইল ফাইন্যান্সিয়ালে চ্যাম্পিয়ন, সবার হাতেই এখন একটা করে মোবাইল আছে। বাংলাদেশে এখন সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ আসছে। কোভিডে ই-কমার্স ব্যাবসাবাণিজ্যের লাইফ লাইনে পরিণত হয়েছে। আমাদের এখন লক্ষ্য ইনোভেশন ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা। কৃষি, পোশাক ও প্রবাসী আয়ই ছিল এতদিন আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। কিন্তু এখন শ্রম থেকে আমরা প্রযুক্তিনির্ভর হয়েছি। আমরা মনে করি, ঐ সময়ের মধ্যে আমাদের উদ্ভাবক ও তরুণ উদ্যোক্তারা চাকরি না খুঁজে চাকরিদাতা হবেন। এভাবেই ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে মেধানির্ভর অর্থনীতি এবং ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির দেশ।

দেশের ১০টি গ্রামে স্মার্ট এগ্রিকালচার পাইলট প্রজেক্ট বাস্তবায়ন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, পানি, সার ও কীটনাশকসহ সার্বিকভাবে অর্থ

খরচ কমানোর লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে দেশে ১০টি গ্রামে স্মার্ট এগ্রিকালচার পাইলট প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, কৃষিতে ইন্টারনেট অব থিংস, ডেটা এনালিটিক্স, ড্রোন, মেশিন লার্নিং রোবোটিক্স– এসব আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে একদিকে যেমন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, অপরদিকে শিক্ষিত তরুণরাও কৃষিকাজে উদ্বুদ্ধ হবে। ২৭শে মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে সিংড়া উপজেলার ছয় হাজার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে আউশ ধানের বীজ ও সার বিতরণ অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের নির্দেশনায় আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে স্মার্ট কৃষি কার্যক্রম শুরু করছি। যে স্মার্ট কৃষি কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে, কীভাবে স্বল্প সম্পদ বিনিয়োগে প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। তিনি বলেন, আমরা অল্প পানি, অল্প সার, অল্প কীটনাশক দিয়ে যদি অধিক ফসল ফলাতে পারি, তাহলে কৃষিতে খরচ বাঁচবে এবং উৎপাদন বাড়বে। এর ফলে ১৭ কোটি মানুষের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা মেটানো সম্ভব।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

পাবলিক প্লেসে 'ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার'

দেশের সব ধরনের সরকারি-বেসরকারি কর্মস্থল, এয়ারপোর্ট, বাস স্ট্যান্ড, রেলওয়ে স্টেশন, শপিং মলের মতো জনসমাগম স্থলে এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে 'ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার' স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। মা ও শিশুদের অধিকার রক্ষায় হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিলের পরিপ্রেক্ষিতে রুল, নির্দেশনাগুলো এবং চূড়ান্ত শুনানির পর ৪ঠা এপ্রিল হাইকোর্ট এ যুগান্তকারী রায় ঘোষণা দেয়। সংবিধানের ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদে স্বীকৃত অন্যতম মৌলিক অধিকার বিষয়ক এ রায় নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক রায়।

বিচারিক আদালতসহ বিভিন্ন জায়গায় একাধিক ব্রেস্ট ফিডিং রুম ইতোমধ্যেই স্থাপিত হয়েছে। এই যুগান্তকারী রায়ের পূর্ণ বাস্তবায়ন হলে কর্মজীবী নারীরা শিশুদের কর্মক্ষেত্রে রেখেই স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে পারবেন।

'বাংলা কিউআর' কোডে লেনদেন

নগদ টাকার ব্যবহার কমাতে রাজধানীর মতিঝিল ও গুলশানের পর এবার গোপালগঞ্জ, রংপুর, গাজীপুর ও নাটোর জেলা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় 'বাংলা কিউআর' কোডে লেনদেন চালু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলা কিউআর (কুইক রেসপন্স) হলো, দেশের সব ব্যাংক ও মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের (এমএফএস) অ্যাপভিত্তিক লেনদেন নিষ্পত্তির একটি কমন প্ল্যাটফর্ম। এই কমন প্ল্যাটফর্মে যুক্ত যে-কোনো ব্যাংক বা এমএফএস-এর গ্রাহক যে-কোনো অন্য কিউআর থেকে পরিশোধ করতে পারবেন।

নগদ টাকার ব্যবহার কমানো, লেনদেনে স্বচ্ছতা বাড়ানো, ঝুঁকিমুক্ত, কম খরচ ও দ্রুত লেনদেন করতে এবং ক্যাশলেস সোসাইটি গঠনের লক্ষ্য নিয়ে এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আগামী ৩০শে জুনের পর 'বাংলা কিউআর' ছাড়া আর কোনো কিউআর কোডভিত্তিক লেনদেন ব্যবস্থা না রাখারও নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

কলার লোকেশন ট্র্যাকার

বনজঙ্গল কিংবা গভীর সমুদ্রে পথ হারালে নিজেদের সঠিক অবস্থান বলতে পারতেন না সেবাপ্রার্থীরা। বিপদে পরে কিছু ক্ষেত্রে নিজেদের পরিচয় জানাতেও চলে যেত অনেকটা সময়। এসবের মধ্যে অযাচিত কিছু ফোন কলের ঝক্কিও সামলাতে হতো ৯৯৯ কর্তৃপক্ষকে। এসব সমস্যা সমাধানে চালু হচ্ছে 'কলার লোকেশন ট্র্যাকার'। নাম-ঠিকানা-অবস্থান না বলতে পারলেও জাতীয় সেবা দেওয়া এ কর্তৃপক্ষ সহজে পৌঁছে যাবে সেবাপ্রত্যাশীর কাছে। এতে যেমন গ্রাহকের সময় বাঁচবে, অন্যদিকে আরও দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেবা দিতে পারবে ৯৯৯। এছাড়া বিরক্তিকর কল এড়াতেও কলার লোকেশন ট্র্যাকার কাজে আসবে। এতে সত্যিকারের ভুক্তভোগীদের আরও দ্রুত সেবা দেওয়া সম্ভব হবে।

শিশুরাও হজে যেতে পারবে

চলতি বছর ১২ বছরের কম বয়সি শিশুরাও হজ পালন করতে পারবে বলে জানিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়। সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় ধর্ম মন্ত্রণালয়। এতে বলা হয়, সৌদি সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী এবছর হজ পালনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো বয়সসীমা নেই। সে কারণে ১২ বছরের নীচের বয়সি শিশুরাও হজ পালন করতে পারবে।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

৮ অর্থনীতি : বিশেষ প্রতিবেদন

কলাগাছের সুতায় শাড়ি তৈরি

কলাগাছের তন্তুজাত সুতা থেকে তৈরি করা হয়েছে শাড়ি। ২রা মার্চ বান্দরবানে সংবাদ সম্মেলনে সেই শাড়ি দেখানো হয়। সহজলভ্য কলাগাছ থেকে তৈরি সুতায় নানা ধরনের শোপিস আগে থেকেই বানানো হচ্ছিল। এবার মণিপুরি বয়নশিল্পীরা তা দিয়ে শাড়ি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। বলা হচ্ছে, দেশে এটিই কলাগাছের তন্তু দিয়ে শাড়ি তৈরির প্রথম ঘটনা। বান্দরবান জেলা প্রশাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় এ সাফল্য পেয়েছেন শাড়ি তৈরির মূল কারিগর মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের রাধাবতী দেবী।

মৌলভীবাজারের মণিপুরি তাঁতশিল্পী রাধাবতী দেবীর সাড়ে ১৩ হাত দৈর্ঘ্যের শাড়িটি বুনন করতে সময় লেগেছে ১৫ দিন। এই শাড়ি তৈরিতে কলাগাছের তন্তু ছাড়া অন্য কোনো উপকরণই ব্যবহার করা হয়নি। বিভিন্ন রঙের নকশা দিয়ে জামদানির একটি আবহ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। রাধাবতীর মতে, প্রথম শাড়িটি তৈরি করতে গিয়ে কিছুটা বেশি সময় লেগেছে। স্থানীয়ভাবে দক্ষ বুননশিল্পী গড়ে তোলা গেলে ধীরে ধীরে সময় আরও কমে আসবে।

৪৪ ব্যবসায়ী সিআইপি

বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপন, পণ্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ ৪৪ ব্যক্তিকে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) বা সিআইপি নির্বাচন করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়। ৩রা এপ্রিল এক গেজেটের মাধ্যমে তাদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

এনসিআইডি ক্যাটাগরিতে ছয়জন, বৃহৎ শিল্প (উৎপাদন) ক্যাটাগরিতে ২০ জন এবং বৃহৎ শিল্প (সেবা) ক্যাটাগরিতে পাঁচজন, মাঝারি শিল্প (উৎপাদন) ক্যাটাগরিতে ১০ জন, ক্ষুদ্র শিল্প (উৎপাদন) ক্যাটাগরিতে দুজন ও মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরিতে একজন বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

আগামী এক বছরের জন্য এই ব্যক্তিরা জাতীয় অনুষ্ঠানে নাগরিক সংবর্ধনায় দাওয়াত, ব্যাবসা সংক্রান্ত কাজে ভ্রমণের সময় বিমান, রেলপথ, সড়ক ও জলপথে সরকারি যানবাহনে আসন সংরক্ষণে অগ্রাধিকার ও বিমানবন্দরে ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের সুবিধা পাবেন। এছাড়া সরকারের শিল্প বিষয়ক নীতিনির্ধারণী কমিটিতে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রেও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের জন্য 'লেটার অব ইন্ট্রোডাকশন' দেবে। আনুষ্ঠানিকভাবে সিআইপি কার্ড হস্তান্তর করবে শিল্প মন্ত্রণালয়।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২শে মার্চ ২০২৩ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৭ জেলাকে ভূমি ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা এবং ৩৯ হাজার ৩৬৫ পরিবারকে জমিসহ গৃহ হস্তান্তর উদ্বোধন করেন –পিআইডি

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

চতুর্থ ধাপে গৃহহীনদের মাঝে ঘর দিলেন প্রধানমন্ত্রী

গ্রামের নাম নয়াপাড়া। রয়েছে চওড়া রাস্তা, মসজিদ, স্কুল, খেলার মাঠ, কমিউনিটি সেন্টার, পুকুর, কবরস্থানসহ নানা নাগরিক সুবিধা। সুপেয় পানির ব্যবস্থাসহ প্রতিটি ঘরে রয়েছে আলাদা বাথরুম ও বারান্দা। গৃহহীন এ সকল মানুষদের কাগজে-কলমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে জমিসহ ঘরগুলো। সবুজে ঘেরা এ গ্রামটি সন্ধ্যা হলেই বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে। পালটে গেছে এখানকার মানুষদের জীবনধারাও। এতে আশ্রয় নিয়েছে ১৪২টি পরিবার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আশ্রয়ণ প্রকল্প-২-এর আওতায় এভাবেই গড়ে তোলা হয়েছে এ গ্রামটি। গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলায় প্রায় ২৪ বিঘা জমির ওপর দৃষ্টিনন্দন এ প্রকল্পটি গড়ে উঠেছে।

প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্পের প্রতিটি ঘর নির্মাণে বরাদ্দ ২ লাখ ৬৪ হাজার টাকা। কিন্তু এখানে প্রতিটি ঘর নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩ লাখ টাকার বেশি। জেলা প্রশাসকের স্থানীয় তহবিল থেকে বাকি অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এই গ্রামের বাসিন্দাদের দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ গ্রামের আশপাশে প্রায় ৩০টি শিল্পকারখানা রয়েছে। সেসব কারখানায় এখানকার বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাকরির ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়াও শাকসবজির আবাদ, পুকুরে মাছ চাষ, গরু-ছাগল কিংবা হাঁস-মুরগি পালনেও থাকছে সহযোগিতা।

২২শে মার্চ গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নয়াপাড়াসহ সারা দেশে আশ্রয়ণ প্রকল্প-২-এর আওতায় ভূমিহীনদের পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের আগে চতুর্থ ধাপে ৩৯৩৬৫টি ঘর হস্তান্তর করেছেন। এর আগে প্রথম ধাপে ৬৩ হাজার ৯৯৯টি, দ্বিতীয় ধাপে ৫৩ হাজার ৩৩০টি এবং তৃতীয় ধাপে ৫৯ হাজার ১৩৩টি ঘর বিতরণ করা হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্প-২-এর আওতায় নতুন করে আরও ৩৯৩৬৫টি বাড়ি বিতরণের ফলে মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২,১৫,৮২৭টি।

প্রধানমন্ত্রী এবারের দুটি (পঞ্চগড় ও মাগুরা)সহ মোট নয়টি জেলা এবং ৪০টি উপজেলাসহ মোট ২১১টি উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ৮ই মার্চ পালিত হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস। 'ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে

নিরসন'– এই প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও উদ্‌যাপিত হয়েছে দিবসটি। এবার পবিত্র শবে বরাত ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস একই দিনে হওয়ায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অনুষ্ঠানে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক পৃথক বাণী দেন। বাণীতে তাঁরা বিশ্বের সকল নারীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বাণীতে বলেন, বাংলাদেশ গত এক দশকে আর্থসামাজিক খাত ও নারীর ক্ষমতায়নে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রশাসন ও তৃণমূল পর্যন্ত নারীর ক্ষমতায়নের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। নারী শিক্ষা নিশ্চিত করা, নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা, সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করতে আইন প্রণয়ন এবং কর্মক্ষেত্র ও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে সরকার।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাণীতে বলেন, নারী আন্দোলনের ইতিহাসে আজ এক গৌরবময় দিন। দীর্ঘ কর্মঘণ্টা আর মজুরি বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে নারী আদায় করেছিল তার অধিকার।

তিন নারী পেলেন 'শ্রেষ্ঠ উদ্যোক্তা সম্মাননা'

বছরব্যাপী প্রান্তিক নারীদের আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনজন নারী উদ্যোক্তাকে 'শ্রেষ্ঠ উদ্যোক্তা সম্মাননা' প্রদান করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে অ্যাস্পায়ার টু ইনোভেশন (এটুআই) প্রকল্প আয়োজিত 'আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে নারীর সমৃদ্ধি' শীর্ষক নারী উদ্যোক্তা সম্মেলনে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়। এটুআইয়ের 'সাথি' নেটওয়ার্কের নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে ১৫ই মার্চ আগারগাঁওয়ে আইসিটি টাওয়ারে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মাননা পাওয়া তিন নারী হলেন– সিরাজগঞ্জের রায় দৌলতপুর ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মোছা. মারুফা ইয়াসমিন, সুনামগঞ্জের আটগাঁও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের শেফালী খাতুন এবং কুমিল্লার আগানগর ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মোসা. শামছুন্নাহার।

সম্মেলনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, ১৪ বছরে নারী উদ্যোক্তারা গ্রাম থেকে শহর– সব জায়গাতেই সফল হয়েছে। কারণ, সরকার নারীদের এগিয়ে নিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। দেশের প্রতিটি ডিজিটাল সেন্টারে একজন পুরুষ উদ্যোক্তার পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তাকে যুক্ত করা হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ডিজিটাল সেন্টারগুলো মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

রাঁধুনী কীর্তিমতী সম্মাননা পেলেন চার নারী

সমাজকল্যাণ, সাংবাদিকতা, ব্যবসায় উদ্যোগ ও ক্রীড়া– এই চার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য চার নারীকে দেওয়া হয়েছে রাঁধুনী কীর্তিমতী সম্মাননা ২০২২। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে ৩রা মার্চ রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাদের হাতে এই সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়।

কীর্তিমতী চার নারীর একজন ময়মনসিংহের সেলিনা আক্তার। তিনি যৌতুক, বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক ব্যাধি নির্মূলে কাজ করছেন। ময়মনসিংহের শতাধিক অসহায়, নির্যাতিত, প্রতিবন্ধী ও গৃহহীন নারীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। তাকে দেওয়া হয় কীর্তিমতী হিতৈষী সম্মাননা। সাংবাদিকতায় সম্মাননা পেয়েছেন রংপুরের সাংবাদিক লাবনী ইয়াসমিন। ১০ বছর ধরে ঐ অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধিকারের পাশাপাশি নানা অনিয়ম বিষয়ে প্রতিবেদন করে সমাজে দৃশ্যমান পরিবর্তনে ভূমিকা রেখে চলেছেন এই সাংবাদিক। কীর্তিমতী উদ্যোক্তা সম্মাননা পেয়েছেন বরিশালের নাজমুন নাহার রীনা। তার প্রতিষ্ঠিত কুটির ও বস্ত্রশিল্পসহ বিভিন্ন ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে শতাধিক মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি ও প্রতিবন্ধী নারীদের পুনর্বাসনে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। কীর্তিমতী ক্রীড়াবিদ সম্মাননা পেয়েছেন একসময়ের দেশের দ্রুততম মানবী রেহানা পারভীন। সাফ গেমসে পদক জয়ী খুলনার এই দৌড়বিদ সাফ গেমসের আম্পায়ার, সংগঠক, রেফারি ও বিচারক। উল্লেখ্য, স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের ব্র্যান্ড 'রাঁধুনী' প্রায় দেড় যুগ ধরে এই পুরস্কার দিয়ে আসছে।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি জমিতে ভুট্টার আবাদ

যশোর কৃষি জোনের আওতায় চলতি মৌসুমে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৬ জেলায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৭ হাজার ৬৭৬ হেক্টর বেশি জমিতে ভুট্টার আবাদ হয়েছে। এ কৃষি জোনের আওতায় যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় আবাদ হয়েছে ৯৮ হাজার ৫৩৯ হেক্টর জমিতে, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি। আবাদ হওয়া জমিতে প্রায় ১১ লক্ষ টন ভুট্টা

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ৪ঠা এপ্রিল ২০২৩ ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আলু রপ্তানির জন্য বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন –পিআইডি

উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে বলে কৃষি কর্মকর্তারা জানান। যশোর আঞ্চলিক কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয়ের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো. রফিকুল ইসলাম ২১শে মার্চ সংবাদ মাধ্যমকে জানান, চলতি মৌসুমে (২০২২-২০২৩) এ কৃষি জোনের আওতায় চুয়াডাঙ্গা জেলায় সবচেয়ে বেশি জমিতে ভুট্টার চাষ হয়েছে। এ জেলায় ভুট্টা চাষের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৮ হাজার ৭১০ হেক্টর জমিতে। এ জেলায় ভুট্টা আবাদ হয়েছে ৪৯ হাজার ৪২০ হেক্টর জমিতে। মেহেরপুর জেলায় ভুট্টা চাষের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৪ হাজার ৫০০ হেক্টর জমিতে। এই জেলায় ভুট্টার আবাদ হয়েছে ১৮ হাজার হেক্টর জমিতে। ঝিনাইদহ জেলায় ভুট্টা চাষের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৫ হাজার ১১২ হেক্টর জমিতে। এ জেলায় ভুট্টার আবাদ হয়েছে ১৬ হাজার ৬৮০ হেক্টর জমিতে। কুষ্টিয়া জেলায় ভুট্টা চাষের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯ হাজার ৯১৬ হেক্টর জমিতে। এ জেলায় আবাদ হয়েছে ১১ হাজার ৯৫০ হেক্টর জমিতে। মাগুরা জেলায় ভুট্টা চাষের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ হাজার ৫০ হেক্টর জমিতে। এ জেলায় ভুট্টার আবাদ হয়েছে ১ হাজার ২৫২ হেক্টর জমিতে এবং যশোর জেলায় ভুট্টা চাষের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ হাজার ৫৭৫ হেক্টর জমিতে। এ জেলায় ভুট্টার আবাদ হয়েছে ১ হাজার ২৩৭ হেক্টর জমিতে।

চলতি মৌসুমে গমের বাম্পার ফলন

চলতি মৌসুমে জেলায় জেলায় গমের বাম্পার ফলন হয়েছে। গত বছরের তুলনায় এবছর বেশি গম চাষাবাদ হওয়ায় ছাড়িয়ে গেছে গম চাষের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী, এবছর উপজেলাটিতে ৭০৫ হেক্টর জমিতে গমের আবাদ হয়েছে। এর মধ্যে বারি গম-৩০ ও বারি গম-৩২ উল্লেখযোগ্য হারে চাষ হয়েছে। উল্লেখ্য, উপজেলায় এবার যে গম চাষ হয়েছে তার বেশির ভাগই সরকারি প্রণোদনার আওতাভুক্ত।

এদিকে আবাদের আনুমানিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩১৭২ মেট্রিক টন। এছাড়া রোগবালাইয়ের তেমন আক্রমণ না থাকায় কৃষকেরা গমের ভালো ফলন পাচ্ছেন। খরচ কম লাভ বেশি হওয়ায় গম চাষাবাদে আগ্রহী হচ্ছে কৃষকরা। তাছাড়া সরকার প্রণোদনার আওতায় চলতি মৌসুমে জেলায় জেলায় কৃষকদের মধ্যে বিভিন্ন প্রদর্শনীর জন্য সার, বীজ ও কীটনাশক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনঃ জান্নাত হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্ব আবহাওয়া দিবস ২০২৩

'The Future of Weather, Climate and Water Across Generations'– প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২৩শে মার্চ ২০২৩ পালিত হয় 'বিশ্ব আবহাওয়া দিবস'। দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ তাঁর বাণীতে বলেন, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ হলেও তা দিনে দিনে চরমভাবাপন্ন হয়ে উঠছে। ফলে দেশের কৃষি, জনস্বাস্থ্য, মৎস্য, জীববৈচিত্র্যসহ সামগ্রিক ক্ষেত্রে এর বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। জলবায়ু ও আবহাওয়ার পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলার জন্য বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশও বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করছে। আবহাওয়া, জলবায়ু ও পানির প্রভাবে সৃষ্ট দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ ও তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য বিদ্যমান প্রযুক্তির সাথে উন্নততর গাণিতিক মডেল, সর্বাধুনিক রাডার ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তি সংযোজন করা হয়েছে। ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের অধিকতর সঠিক ও আগাম পূর্বাভাস প্রদানের মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান ৫ই এপ্রিল ২০২৩ ঢাকায় হোটেল সোনারগাঁওয়ে স্থানীয় পর্যায়ে বন্যার আগাম সতর্কবার্তা ও প্রচার ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের বার্ষিক অগ্রগতি অবহিতকরণ কর্মশালা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ডাটাবেজ পোর্টাল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন –পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাণীতে বলেন, আমরা জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনকে প্রাধান্য দিয়ে ১০০ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির কারণে বিশ্বে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি মানবসৃষ্ট দুর্যোগও বাড়ছে, দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা ও দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা জানতে মোবাইলে '১০৯০' নম্বরে টোল ফ্রি সার্ভিস চালু করা হয়েছে। আমাদের সরকার কৃষি আবহাওয়া পূর্বাভাস ও পরামর্শ সেবার মান উন্নয়নে ৭টি নতুন কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার স্থাপনসহ কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করছে। ৫টি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার, ৯টি ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র এবং ১৪টি নদী বন্দরে নৌ-দুর্ঘটনা প্রশমনের লক্ষ্যে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া স্থাপনা করা হয়েছে তিনটি স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন। দুইটি আধুনিক ডপলার রাডার স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। দেশের ১৩টি উপকূলীয় জেলায় স্যাটেলাইট টেলিফোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গৃহীত এসকল পদক্ষেপ জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছে।

এসডিজি'র অন্যতম লক্ষ্যমাত্রা হলো জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন, অভিযোজন, প্রভাব নিরসন ও আগাম সতর্কতা বিষয়ে শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানব ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার উন্নতি সাধন। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের সঠিক মাত্রা নির্ণয় এবং এর যথাযথ প্রয়োগ ও তথ্য প্রদানে আবহাওয়া অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার পদ্মা সেতুতে মোটরসাইকেল চলার অনুমতি

পদ্মা সেতুতে মোটরসাইকেল চলার অনুমতি প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার বলে জানান সড়ক, পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। ২০শে এপ্রিল মুন্সিগঞ্জের মাওয়ায় পদ্মা সেতুর টোলপ্লাজা পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি এসব কথা বলেন। সড়ক, পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, একনেকের সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত দিলেন যে, ঈদ উপলক্ষে পদ্মা সেতুতে মোটরসাইকেল চলাচল করবে। তিনি আরও বলেন, আশা করি যারা সেতুতে মোটরসাইকেলে আসা-যাওয়া করবেন তারা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন। কারণ পদ্মা সেতু জাতির সম্পদ। এই সম্পদ সুশৃঙ্খলভাবে ব্যবহার করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। এ সময় সেতু সচিব মো. মনজুর হোসেনসহ সেতু বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ২০শে এপ্রিল সকাল ৬টা থেকে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে পদ্মা সেতু দিয়ে সাময়িকভাবে মোটরসাইকেল চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত টোল দিয়ে সর্বোচ্চ ৬০ কিলোমিটার গতিতে মোটরসাইকেল সেতু পারাপার হতে পারবে। মোটরসাইকেলের জন্য নির্ধারিত টোলবুথ ও নির্ধারিত লেন ব্যবহার করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই নির্ধারিত লেন পরিবর্তন করা যাবে না, ওভারটেকও করা যাবে না। চালক ও আরোহীকে হেলমেটসহ প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাসামগ্রী ব্যবহার করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই সেতুর উপর দাঁড়ানো বা ছবি তোলা যাবে না। চালকসহ সর্বোচ্চ দুজন মোটরসাইকেলে চড়তে পারবে। ১৮ই এপ্রিল বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

পদ্মা সেতু আর শৃঙ্খল সড়কে ঈদ যাত্রায় স্বস্তি

পদ্মা সেতু চালু ও সড়ক পরিস্থিতি ভালো থাকার পাশাপাশি পুলিশের সমন্বিত উদ্যোগের কারণে এবারের ঈদ যাত্রা স্বস্তিদায়ক হচ্ছে বলে জানান পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন। তিনি ২০শে এপ্রিল গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তায় মহাসড়ক পরিস্থিতি পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন।

আইজিপি বলেন, নির্ধারিত সময়ে সাধারণ মানুষ যেন গন্তব্যে যেতে পারে, সেজন্য পুলিশ সদস্যদের পাশাপাশি সিটিটিসি, সোয়াত, ডিবি, বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট ও ডগ স্কোয়াডসহ বিভিন্ন সংস্থা সমন্বিতভাবে কাজ করছে। দূরপাল্লার যাত্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে যদি কোনো চালক বিশ্রাম না নিয়ে গাড়ি চালান অথবা বেপরোয়া গাড়ি চালান, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দুর্ঘটনা রোধে পণ্যবাহী পরিবহণে যাত্রী পরিবহণ বন্ধে পুলিশ কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে। মহাসড়কে পুলিশের পাশাপাশি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা দায়িত্ব পালন করছেন।

ঈদের ট্রেন যাত্রায় স্বস্তি

ঈদের ছুটিতে নাড়ির টানে বাড়ির পথে শহুরে মানুষ। কোনো ধরনের ঝক্কি ঝামেলা ছাড়া স্বস্তি নিয়ে নাড়ির টানে ছুটছে মানুষ। রাজধানীর কমলাপুর রেলস্টেশনে কড়া চেকিংয়ে স্টেশনের ভেতরে প্রবেশ করেন যাত্রীরা। প্ল্যাটফরমে ট্রেন আসলেই সবাই আনন্দের সঙ্গে উঠছেন। নির্দিষ্ট সময় পর পর একের পর এক ছেড়ে যাচ্ছে ট্রেন। শিডিউল বিপর্যয়ের অভিযোগ নেই। ঈদ যাত্রায় এমন অভিজ্ঞতায় স্বস্তি প্রকাশ করেন যাত্রীরা।

যাত্রীরা জানান, এবারের ঈদ যাত্রায় ট্রেনে কোনো ধরনের দুর্ভোগ হয়নি। অনলাইনে টিকিট কাটায় তেমন ভোগান্তি পোহাতে হয়নি। স্বস্তি নিয়েই যাতায়াত করেন তারা। এবারই প্রথম 'টিকিট যার, ভ্রমণ তার' কার্যক্রম শুরু করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৭ই এপ্রিল থেকে অনলাইনে শুরু হয় নিজের এনআইডির (জাতীয় পরিচয়পত্র) মাধ্যমে যাত্রীদের টিকিট প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় টিকিটের সঙ্গে এনআইডি মিলিয়ে তারপরেই প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় যাত্রীদের। তিন স্তরে টিকিট চেকিং করা হয়। টিকিট ছাড়া কোনো যাত্রীকেই স্টেশনের ভেতরে প্রবেশ করতে দেয় না নিরাপত্তা প্রহরীরা।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

বেঙ্গালুরু চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত *নকশিকাঁথার জমিন*

ভারতের বেঙ্গালুরুতে ১৪তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সিনেমা *নকশিকাঁথার জমিন*। ২৩শে মার্চ থেকে শুরু হওয়া চলচ্চিত্রের এই আন্তর্জাতিক উৎসবে এশিয়ান কম্পিটিশন বিভাগে ১৪টি চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে যৌথভাবে তৃতীয় পুরস্কার জিতেছে *নকশিকাঁথার জমিন* ও *ভিরাটাপুরা ভিরাগি*। এতে *বিফোর*, *নাও অ্যান্ড দেন* ও *মাদারলেস* যৌথভাবে শ্রেষ্ঠ এবং *স্যান্ড* দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের মর্যাদা পায়। টিএম ফিল্মস প্রযোজিত সরকারি অনুদানের *নকশিকাঁথার জমিন* চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছেন আকরাম খান।

কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের 'বিধবাদের কথা' গল্প অবলম্বনে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোর কথা তুলে ধরা হয়েছে এই সিনেমায়। এতে দুই বোনের চরিত্রে জয়া আহসান ও সেঁওতি; দুই ভাইয়ের চরিত্রে ইরেশ যাকের ও রওনক হাসান অভিনয় করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ দুই চরিত্রে আছেন দুই ভাই দিব্য জ্যোতি ও সৌম্য জ্যোতি। এর আগে ৫৩তম ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অব ইন্ডিয়ায় (আইএফএফআই) আইসিএফটি-ইউনেসকো গান্ধী মেডেলের জন্য মনোনীত হয়ে দেশের জন্য সম্মান বয়ে আনে *নকশিকাঁথার জমিন*।

ছেঁউড়িয়ায় লালন উৎসব

বাউল সম্রাট লালনের সাধনভূমি কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়া। ১৮৯০ সালে এখানেই দেহত্যাগ করেন এই মানবতাবাদী সাধক। বাউল সম্রাট লালন শাহ তাঁর জীবদ্দশায় ছেঁউড়িয়ার এই আখড়াবাড়িতে প্রতিবছর চৈত্রের দোলপূর্ণিমা রাতে বাউলদের নিয়ে সাধুসঙ্গ উৎসব করতেন। ভক্ত-অনুসারীদের কাছে সাঁইজি নামে পরিচিত লালনের মৃত্যুর পর একসময় এই উৎসবের নামকরণ হয় স্মরণোৎসব।

১২৯৭ বঙ্গাব্দের পয়লা কার্তিক তাঁর মৃত্যুর পরও এই উৎসব চালিয়ে আসছে তাঁর অনুসারীরা। এবারও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় লালন একাডেমি ৪ঠা মার্চ এই স্মরণোৎসবের আয়োজন করে। এবার শব-ই-বরাতের কারণে দুদিন এগিয়ে আনা হয়েছে অনুষ্ঠানমালা। চিরাচরিত বৈশিষ্ট্যে অনুষ্ঠিত লালনধামে উৎসবের প্রথম দিন থেকেই একতারা, ঢোল ও বাঁশির সুরে মাতোয়ারা হয়েছে হাজারো প্রাণ। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা লালনের অনুসারীরা ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে গাইতে থাকেন লালন শাহর আধ্যাত্মিক গান।

নানা আয়োজনে বিশ্ব নাট্য দিবস

২৭শে মার্চ বিশ্বজুড়ে উদ্‌যাপিত হয় বিশ্ব নাট্য দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও নানা আয়োজনে উদ্‌যাপিত হয় বিশ্ব নাট্য দিবস। বিশ্বের সব নাট্যকর্মী ও শিল্পীর মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন ও নাটকের শক্তিকে নতুন করে আবিষ্কার করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে দিবসটি পালন করে শিল্পকলা একাডেমি, আইটিআই বাংলাদেশ কেন্দ্র, গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন ও পথনাটক পরিষদ। এদিন শিল্পকলা একাডেমি থেকে বের হয় বর্ণিল শোভাযাত্রা। শিল্পকলা একাডেমি থেকে বের হওয়া আনন্দ শোভাযাত্রাটি শেষ হয় জাতীয় নাট্যশালার সামনে। সন্ধ্যা সাতটায় শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার মূল হলে আলোচনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা পর্বে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।

এবার 'বিশ্ব নাট্য দিবস ২০২৩' সম্মাননা পান অভিনয়শিল্পী, নাট্যকার ও নির্দেশক মামুনুর রশীদ। তাকে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ও গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী লাকী।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ঢাকায় বাংলাদেশ আর্মি স্টেডিয়ামে ২১শে মার্চ ২০২৩ 'বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২২'-এর ফাইনাল খেলায় চ্যাম্পিয়ন দলের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা –পিআইডি

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

ত্রিদেশীয় অনূর্ধ্ব-১৯ সিরিজে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজের ফাইনালে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে ছয় উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ৩০শে মার্চ আবুধাবিতে বাংলাদেশের মুখোমুখি হয় আফগানিস্তান। শুরু থেকেই আফগান ব্যাটারদের চাপে ফেলেন বাংলাদেশি বোলাররা। প্রথমে ব্যাট করে ৩৭ ওভারে ১৪৩ রানে অলআউট হয়ে যায় আফগানিস্তান। জবাবে বাংলাদেশ ২৩.২ ওভারে চার উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়।

নিজেদের আঙিনায় মেয়েরা দ্বিতীয়

মেয়েদের সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে শেষ পর্যন্ত রানার্সআপ হয়েছে স্বাগতিক বাংলাদেশ। ২৮শে মার্চ কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের লিগ পর্বের শেষে ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও নেপালের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে বাংলাদেশ। এই ড্রতে চার ম্যাচে সাত পয়েন্ট নিয়ে আসরের দ্বিতীয় স্থান পায় বাংলাদেশের মেয়েরা।

বঙ্গবন্ধু কাপ আন্তর্জাতিক কাবাডিতে হ্যাট্রিক চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

পল্টনের শহীদ নূর হোসেন ভলিবল স্টেডিয়ামে ২১শে মার্চ উপস্থিত প্রায় তিন হাজার দর্শকের সামনে ফেভারিটের মতো খেলেই জিতেছে বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু কাপ আন্তর্জাতিক কাবাডিতে হ্যাট্রিক শিরোপা জিতেছে বাংলাদেশ। ফাইনালে উঠেছে ৭ ম্যাচে অপরাজিত থেকে। ফাইনালে চীনা তাইপেকে বাংলাদেশ হারিয়েছে ৪২-২৮ পয়েন্টে।

এমসিসির আজীবন সদস্য মাশরাফি

ক্রিকেটের আইন প্রণেতা মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাবের (এমসিসি) প্রথম বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে আজীবন সদস্যপদ পেলেন বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা। এই বছর এমসিসির আজীবন সদস্যপদ দেওয়া হয়েছে ১৯ জনকে, যেখানে আছেন ৮টি টেস্ট খেলুড়ে দেশের সাবেক খেলোয়াড়রা। ইংল্যান্ড ও ভারতের আছেন ৫ জন করে সাবেক খেলোয়াড়। ৫ই এপ্রিল তালিকায় জায়গা পাওয়া ১৯ জনের মধ্যে ১৭ জন ক্রিকেটার, বাকি দুজন ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিত্ব। এ দুজন সম্মানসূচক আজীবন সদস্যপদ পেয়েছেন ক্রিকেটে তাদের অবদানের কারণে।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

চলে গেলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অভিনেতা এম. খালেকুজ্জামান

আফরোজা রুমা

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও নাট্যব্যক্তিত্ব এম. খালেকুজ্জামান চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ২১শে মার্চ গুলশানে নিজ বাসায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

এম. খালেকুজ্জামান ১৯৫০ সালের ২রা জানুয়ারি বগুড়ার শান্তাহারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ডা. শামসুজ্জামান ছিলেন ব্রিটিশ রেলওয়ের মেডিকেল অফিসার। মা শায়েস্তা আক্তার জামান ছিলেন গৃহিণী। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য ও চারুকলা বিভাগের প্রথম মাস্টার্স ডিগ্রিধারীদের একজন তিনি। দেশ স্বাধীনের বেশ কয়েক বছর পর খালেকুজ্জামান ১৯৭৫ সালে বিটিভির তালিকাভুক্ত শিল্পী হন। তার আগে স্কুল-কলেজ জীবনে তিনি অসংখ্য মঞ্চ নাটকে অভিনয় করেন। তিনি এ পর্যন্ত প্রায় তিনশো নাটকে অভিনয় করেছেন।

এম. খালেকুজ্জামান বিটিভিতে প্রথম ওয়াজেদ আলী খানের প্রযোজনায় 'সর্পভ্রমে রজ্জু' নাটকে অভিনয় করেন। এরপর তিনি ধারাবাহিক নাটক– 'তমা', 'বড় বাড়ি', 'সময় অসময়', 'সুবর্ণ সময়'সহ বহু নাটকে অভিনয় করেন। তাঁর অভিনয়ের অনুপ্রেরণা প্রয়াত বরেণ্য অভিনেতা গোলাম মুস্তাফা। অভিনয়ে অন্তঃপ্রাণ খালেকুজ্জামানের নেশা এবং পেশা অভিনয়। মিজানুর রহমান আরিয়ান পরিচালিত দেশের আলোচিত টিভি নাটক 'বড় ছেলে'তে বাবার ভূমিকায় অভিনয় করেন গুণী এ অভিনেতা। নাটকের বাইরেও তিনি অর্ধশতাধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। নায়ক রাজ রাজ্জাক ও কবরীর সঙ্গে *অনির্বাণ* চলচ্চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন। চলচ্চিত্রে দীর্ঘদিন বিরতির পর মুরাদ পারভেজের *বৃহন্নলা* চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। এরপর তিনি শিহাব শাহীনের *ছুঁয়ে দিলে মন* চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। তাঁর অভিনীত সর্বশেষ চলচ্চিত্র অনম বিশ্বাসের *দেবী*। তাঁর অভিনীত আরও কিছু উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে *তুমি রবে নীরবে*, *মিশন এক্সট্রিম* ইত্যাদি।

এম. খালেকুজ্জামান প্রথম ছাত্রজীবন থেকেই বঙ্গবন্ধুর আদর্শের রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্সের সদস্য হিসেবে সম্মুখ কাতারের একজন যোদ্ধা ও সংগঠক ছিলেন। সততা, নিষ্ঠা ও নির্লোভ ছিলেন বলে বঙ্গবন্ধুর স্নেহ ও ভালোবাসা লাভ করতে সক্ষম হন তিনি। ব্যক্তিজীবনে কণ্ঠশিল্পী সুলতানা মমতাজ তাঁর সহধর্মিণী ছিলেন।

নিপুণ অভিনয়ের মাধ্যমে এম. খালেকুজ্জামান দর্শকের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন। বহু নাটকে বাবা চরিত্রের অন্যতম সফল অভিনেতা ছিলেন তিনি। তিনি সর্বশেষ 'দুই মাতার সন্তান' এবং 'আবদার' নামে নাটকের শুটিং করেছেন। অভিনয়ের পাশাপাশি এম. খালেকুজ্জামান ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী।

অভিনেতা এম. খালেকুজ্জামানের নামাজের জানাজা কুর্মিটোলার একটি মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন

ডেঙ্গু একটি ভাইরাসজনিত জ্বর যা এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এই মশা সাধারণতঃ ভোরবেলা ও সন্ধ্যার পূর্বে কামড়ায়। সাধারণ চিকিৎসাতেই ডেঙ্গু জ্বর সেরে যায়, তবে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম এবং হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর মারাত্মক হতে পারে। বর্ষার সময় সাধারণত এ রোগের প্রকোপ বাড়ে। এডিস মশার বংশ বৃদ্ধি রোধের মাধ্যমে ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ করা যায়।

টবে জমা পানি

পরিত্যক্ত বালতি/মগের জমা পানি

এডিস মশার লার্ভা

পিউপা

পরিত্যক্ত টায়ারে জমা পানি

পরিত্যক্ত পাত্র

হেমোরেজিক ডেঙ্গু রোগী

পূর্ণাঙ্গ এডিস মশা

এডিস মশার জীবনচক্র

এডিস মশা ডিম পাড়ার ও বংশবিস্তারের স্থান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়ঃ

- আপনার ঘরে এবং আশেপাশে যে কোন জায়গায় পানি জমতে না দেয়া। ফলে এডিস মশার লার্ভা জন্মাতে পারবে না।
- ব্যবহৃত পাত্রের গায়ে লেগে থাকা মশার ডিম অপসারণে পাত্রটি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ঘষে পরিস্কার করতে হবে।
- ফুলের টব, প্লাস্টিকের পাত্র, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের ড্রাম, মাটির পাত্র, বালতি, টিনের কৌটা, ডাবের খোসা/নারিকেলের মালা, কন্টেইনার, মটকা, ব্যাটারী শেল ইত্যাদিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। কাজেই এগুলো বর্জ্য হিসেবে ব্যবস্থা নেয়া।
- অব্যবহৃত পানির পাত্র ধ্বংস অথবা উল্টে রাখতে হবে যাতে পানি না জমে।
- দিনে অথবা রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারী ব্যবহার করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ পত্রিকায় লেখা পাঠানোর নিয়মাবলি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়াধীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিয়মিত প্রকাশনা *সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকায় দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি-সাফল্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য যে-কোনো বিষয়ে প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার, গল্প, কবিতা, গ্রন্থালোচনা, ভ্রমণ কাহিনি ও সামাজিক সচেতনতামূলক লেখা পাঠানো যায়। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত লেখা সংশোধন ও সম্পাদনান্তে প্রকাশিত হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না। লেখা প্রকাশিত হলে সৌজন্য কপি এবং বিধি অনুযায়ী সম্মানী প্রদান করা হয়। লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো অনুসরণীয়:

- মৌলিক লেখা পাঠাতে হবে। প্রকাশিত লেখা বা অন্য কোনো পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রদত্ত লেখা পাঠানো যাবে না।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার ও গল্প সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনূর্ধ্ব দেড় হাজার শব্দ। ন্যূনতম এক হাজার শব্দ হতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে দুই হাজার বা ততোধিক শব্দ গ্রহণযোগ্য। লেখার সঙ্গে মানসম্মত চিত্র (ক্যাপশনসহ) গৃহীত হবে।
- ১৪-২০ পঙ্‌ক্তি/লাইনের কবিতা হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কম/বেশি লাইনসংখ্যা গৃহীত হয়। ছন্দবদ্ধ ও নিপুণ অন্ত্যমিলসমৃদ্ধ কবিতার মনোনয়ন অগ্রাধিকার পাবে। একসঙ্গে কমপক্ষে ৩টি কবিতা পাঠাতে হবে।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার হতে হবে প্রাসঙ্গিক, নির্ভুল, তথ্যসমৃদ্ধ ও মানোন্নত।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র আবশ্যক। লেখার সঙ্গে পাদটীকা ও গ্রাফ ইত্যাদি সহায়ক তথ্য থাকলে ভালো হয়।
- লেখার ভাষা সহজ-সরল, পরিশীলিত ও সাবলীল হতে হবে।
- বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানান রীতি মেনে লেখা পাঠাতে হবে।
- বিশেষ দিবস/সংখ্যার লেখার ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ (তিন) মাস পূর্বে লেখা পাঠাতে হবে।
- মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে সুতনি এমজে (SutonnyMJ) ফন্টে লেখা হতে হবে।
- ইতোমধ্যে প্রকাশিত লেখা/বইয়ের তালিকাসহ সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি এবং ফোন, মোবাইল, ই-মেইল, নগদ/বিকাশ নম্বরসহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা আবশ্যক (*সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকার ক্ষেত্রে নবাগত লেখকদের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য)।
- লেখকের পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) কপি, প্রাতিষ্ঠানিক (স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় বা কর্মস্থল) পরিচয়পত্রের (আইডি) কপি লেখার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে (প্রতিষ্ঠিত লেখকদের জন্য প্রযোজ্য নয়)।

লেখা হাতে হাতে বা প্রধান সম্পাদক/মহাপরিচালক বরাবর ডাকযোগে অথবা dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com ই-মেইলে পাঠানোর অনুরোধ করা হলো। যে-কোনো প্রয়োজনে ০২-৮৩০০৬৮৭ (সম্পাদক), ০২-৮৩০০৭০৪ (সিনিয়র সম্পাদক) নম্বর ফোনে যোগাযোগ করা যাবে। লেখা প্রকাশের অনুরোধ বিষয়ক যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়।

সচিত্র বাংলাদেশ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 43, No. 10, April 2023, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd